ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৩ বর্ষ | ১৫-১৬তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ ফাল্গুন, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ | ২৫ রবিঃ আউঃ, ১৪৩২ হিজরি | ২৮ তবলীগ, ১৩৯০ হি. শা. | ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১১ ঈসাব্দ

ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,
বাংলাদেশের ৮৭তম সালানা জলসায় বক্তব্য প্রদান করছেন
হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি-
মোহতরম মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব।

দারুত তবলীগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের
৮৭তম সালানা জলসায় বক্তব্য প্রদান করছেন মোহতরম
মোবাশশের উর রহমান,
ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের
৮৭তম সালানা জলসার উন্মুক্ত জলসাগাহে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দর্শকশ্রোতা বক্তব্য শুনছেন।

৮৭তম সালানা জলসা
বিঘ্নিত হলেও হুযূর (আই.)-এর দিক-দর্শী সম্ভাষণে অভিষিক্ত

সরকারী প্রশাসনের অনুমতি পাওয়ার পর ঢাকা মহানগরীর অদূরে গাজীপুরস্থ বাংলাদেশ রোভার স্কাউট জাম্বুরী মাঠে খোলা ময়দানে জলসায় যোগদান করে হযরত খলীফতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর আশিস পেতে উদ্বোধনী দিবস ৬ ফেব্রুয়ারীর পূর্ব সন্ধ্যায় দেশের দূর-দূরান্ত থেকে আহমদী নারী-পুরুষ, শিশু, যুবা-বৃদ্ধ একত্রিত হতে শুরু করে। পরদিন অর্থাৎ উদ্বোধনী দিবসের সকাল থেকে দেশের উত্তর- পশ্চিম প্রান্ত হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন পঞ্চগড়ের আহমদনগর আর উত্তর-পূর্ব প্রান্তের হাওড় এলাকা ইসলামগঞ্জ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত বঙ্গোপসাগরের উপকুল ঘেঁষা বড় বাইশদিয়া ও সুন্দরবন এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত রাঙ্গামাটির মাহিল্লা থেকে আবাল বৃদ্ধ বণিতা বাঁধ-ভাঙ্গা জোয়ারের ঢলের ন্যায় যখন ছুটে আসছিল, সেই ক্ষণে *'জলসা অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রত্যাহার'* জেলা প্রশাসনের এই নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সকলকে হতবাক করে দেয়।

৮৭তম জলসা সালানার উদ্বোধন যুগ-খলীফার মধুর সম্ভাষণ স্যাটেলাইট টিভি মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া-তে Live সম্প্রচারিত হবে আর তাঁর এই সম্ভাষণে নিজেদের অভিষিক্ত করতে হাজারো মানুষের উচ্ছ্বল এই সমাবেশ প্রশাসনের হঠকারী এই নির্দেশে ম্রিয়মান হয়ে গেল। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে সকলে দোয়ায় রত হল। জলসা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ উদ্বেগাকুল হয়ে পড়লেন এজন্য যে, দেশের দূর-দূরান্ত থেকে বাস-বহর নিয়ে জলসায় যোগদানকারী কাফেলাকে জলসাগাহে প্রবেশ পথের বিভিন্ন সংযোগ সড়কের মোড়ে-মোড়ে পুলিশ বেরিকেড দিয়ে আটকে দিচ্ছে। অপরদিকে প্রবাসী বাঙ্গালী আহমদীদের নিয়ে লন্ডনস্থ বায়তুল ফুতুহ'তে আয়োজিত বাংলাদেশের ৮৭তম জলসার একই আদলের প্রতিচ্ছবি জলসাগাহে অপেক্ষমান বাংলা ডেস্ক ইনচার্জ মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে চলছেন মূল জলসাগাহে উপস্থিত ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে আর হুযূর (আই.)-কে এখানকার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত করে চলছেন. যাতে যুগ-খলীফার বিশেষ দোয়া লাভের ফলে উদ্ভুত নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব হয়।

অবশেষে যুগ খলীফার দোয়ার বরকতে পরিস্থিতি এতটা অনুকূল হয় যে, লাউড স্পিকার ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে জলসাগাহে লাউড স্পিকার ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয় এবং হুযূর (আই.)-এর সভাপতিত্বে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ'তে অনুষ্ঠিত জলসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান MTA -তে এখানে নির্মিত জলসা প্রাঙ্গনে Live প্রদর্শনের অনুমতি লাভ হয়। তাই এবারের এই ৮৭তম জলসা স্বয়ং হুযূর (আই.) উদ্বোধন করলেন MTA -এর মাধ্যমে।

বলাবাহুল্য, হুযূর (আই.)-এর সম্ভাষণে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ দিকদর্শী গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পেয়ে যায় আর জলসায় যোগদানকারী সকলের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা হুযূরের বক্তব্য শুনার পর একেবারে নির্মল ও শান্তির নিশ্চিত পরশে তৃপ্ত হয়। এরই প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করা যায় পরবর্তী প্রায় ৫-৬ ঘন্টাব্যাপী জলসায় আগমনকারী সকলের নীরব ও সুশৃংখল প্রস্থানে।

খোলা জলসাগাহে আগতদের একটি বড় সংখ্যা ব্যবস্থাপনার নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ বাড়ীতে ফেরত যায় আর অপর একটি সংখ্যা নির্দেশক্রমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কেন্দ্র দারুত তবলীগে জলসার পরবর্তী কার্যক্রমে অংশ নেয়ার জন্য সমবেত হয়।

স্বল্পতম সময়ে দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে সীমিত পরিসরে উন্মুক্ত মঞ্চে আর খোলা আকাশের নীচে অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে জলসার বাকী ২ দিনের অধিবেশনগুলো সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অতএব, এবারের জলসা অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। সেই সাথে বাংলাদেশ জামাত উন্মুক্ত ময়দানে কিভাবে জলসা আয়োজন সুসম্পন্ন করতে পারে তার একটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল, লাভ করল মহান খলীফার গুরুত্বপূর্ণ পথ-নির্দেশ। মহান আল্লাহ্ তাআলা বাংলাদেশ জামাতের এই জলসাকে কবুল করুন আর ভবিষ্যতে আরও বৃহদাকার জলসার আয়োজনের তৌফিক দান করুন।

সরকারী প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্র 'দুষ্টের শাসন আর শিষ্টের পালন'-অঙ্গীকার পূরণে সদা তৎপর থেকে তার সুদৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করবে। আর ধর্মান্ধ ও উগ্র জঙ্গীবাদের কাছে নতজানু হওয়া থেকে বিরত থেকে, বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত শান্তিকামী নাগরিক বৃন্দকে নিস্তার দিবে, এটাই সকলের প্রত্যাশা।

মুসেলেহ্ মাওউদ দিবস অমর হোক

"তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই পুত্র তোমারই সন্তান হবে। ....তার নাম আনুমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে... । তার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে কালেমাতুল্লাহ্-আল্লাহর বাণী। কারণ খোদার দয়া সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে।.... সে শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বন্দীদের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিগণ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে"।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ তাআলা এমনই গুণধর পুত্র সন্তান দান করলেন যার নাম হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) যিনি ইসলামের জন্য অসাধারণ কাজ করে গেছেন। এক খোদার বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়েছেন। কুদরতে সানীয়া-আহমদীয়া খিলাফতের দ্বিতীয় বিকাশ তিনি। অর্ধ শতাধিক বছর ব্যাপী ঐশী সমর্থন পুষ্ট তাঁর খিলাফতকাল অর্ধশতাধিক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে জগতকে করেছে উদ্ভাসিত। ধর্মান্ধতার অন্ধকারকে নির্মূল করে ধর্মের আলোকজ্জ্বল জ্যোতিতে পৃথিবীকে করেছে আলোকময়। তাঁরই খিলাফতকালে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আহমদীয়া মিশন হাউজ স্থাপিত হয় ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রিলিয়াসহ বহু দ্বীপদেশে। এর দীর্ঘ বর্ণনা দেয়ার অবকাশ এখানে নেই। তবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১-এর জুমুআর খুতবার রেশ ধরে বলতে চাই–পবিত্রতার যে উত্তাল তরঙ্গ মালায় জগতকে আলোড়িত করে দিয়েছেন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.), ইনশাআল্লাহ্ পবিত্রতার এ তরীকে আমরা আহমদীয়া খিলাফতের আশিসে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবো আর সর্বপ্রকার অন্ধকার থেকে পদার্পণ করবো আলোর ভূবনে।

mPxc Î

১৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১১

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ৬

হযরত উমর (রা.)
মূল: মাশহুদ আহমদ এবং ফজল আহমদ
ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ ১৬

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আ.) এর রাসূল প্রেম
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ১৯

শিখ ধর্ম-মতের জন্মকথা
- মোহাম্মদ ফজুলুর রহমান ২৫

ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ডেস্ক
"অপরাধীদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে" ২৮

মুসলেহ মাওউদ দিবস ও
প্রাসঙ্গিক কিছু কথা
মাহমুদ আহমদ সুমন ৩০

হযরত শুয়াইব (আ.)-এর
ধর্ম প্রচার
সংকলন : মৌ. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ৩৩

শিক্ষার অন্তরালে ভেজালের হাটবাজার
সরফরাজ এম.এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী ৩৫

অমর একুশে ফেব্রুয়ারী
'সকল ভাষা আল্লাহ্‌রই দান'
ইবনে শহীদ ৩৭

সরল পথ, সহজ পথ ঃ
সিরাতুল মুস্তাকিম
ফরিদ আহমদ ৩৯

প্রতারণার মোবাইল
খালিদ আহমেদ সিরাজী ৪০

'সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট'
১৭ ডিসেম্বর, ২০১০ অনুষ্ঠিত ৪১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৮৭তম
সালানা জলসা কার্যক্রমে হঠাৎ নিষেধাজ্ঞার
প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন ৪৫

৮৭তম জলসা সালানা বিঘ্নিত হওয়ায়
বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায়
প্রকাশিত সংবাদের কিছু ৪৭

৮৭তম জলসা সালানা অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হওয়ায়
বিভিন্ন সংগঠনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ৫০

বাংলাদেশের ৮৭তম সালানা জলসা
ধর্মপ্রাণ সদস্যদের ব্যাপক কুরবানীর
ফলশ্রুতিতে সফলতার সাথে সমাপ্ত ৫১

নবীনদের পাতা–
হযরত রাসূল করীম (সা.) ছিলেন মানবতার আদর্শ ৫৭

কুরআন পাঠের গুরুত্ব ও কল্যাণ ৫৮

অমর সাহাবীর অমর জীবনী
হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রা.) ৫৯

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম ৬১

পাঠক কলাম–
ইসলাম প্রচারে হযরত রাসূল করীম (সা.)
- এর সাহাবীদের অবদান ৬৩

সংবাদ ৬৪

এমটিএ, বাংলা অনুষ্ঠানসূচী ৬৮

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ বাংলাদেশ রোভার্স স্কাউট প্রাঙ্গনের জলসাগাহে **MT.A**-তে **Live** সম্প্রচারিত হুযূর (আই.) -এর উদ্বোধনী ভাষণ-
মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে জলসায় যোগদানকারী সবাই শুনছেন।

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّ اٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۲﴾

৩২। আর সে (অর্থাৎ আযীযের স্ত্রী) যখন তাদের কানাঘুষার কথা শুনতে পেল সে তাদের ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার জায়গার ব্যবস্থা করলো। আর সে তাদের প্রত্যেককে (খাবার কাটার জন্য) একটি করে ছুরি দিল। এরপর সে (ইউসুফকে) বললো, 'এদের সামনে আস।' তারা তাকে দেখা মাত্রই তাকে মহামর্যাদাবান বলে বুঝতে পারলো[১৩৭৯-ক] এবং (বিস্ময়ে হতবাক হয়ে) নিজেদের হাত কেটে ফেললো[১৩৮০]। আর তারা বলে উঠলো, আল্লাহ্ মহিমান্বিত। এ তো মানুষ নয়। এ যে এক সম্মানিত ফিরিশ্‌তা!'*

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَ لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩। সে (অর্থাৎ আযীযের স্ত্রী) বললো, 'দেখ, এ সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করেছ। আর নিশ্চয় আমি তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফুসলানো সত্ত্বেও সে (পাপ কাজ থেকে) নিজেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আমি তাকে যে আদেশ দিচ্ছি সে যদি তা পালন না করে তবে তাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করা হবে এবং নির্ঘাত লাঞ্ছিতদের একজন বলে গণ্য হয়ে যাবে।

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَ اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪। সে (অর্থাৎ ইউসুফ) বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরা আমাকে যেদিকে ডাকছে এর চেয়ে কারাবরণ করাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। আর তুমি যদি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে মুক্ত না কর তাহলে আমি এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

১৩৭৯-ক। তারা তাঁকে পবিত্র, নিষ্পাপ, নির্দোষ ও গম্ভীর ব্যক্তিত্ব বলে মনে করলো।

১৩৮০। এর ব্যাখ্যা এই হতে পারে, যখন সেই রমনীকূল হযরত ইউসুফ (আ.)কে দেখলো তারা তাঁর পবিত্র, নিষ্পাপ ও সৌম্যমূর্তি চেহারা দেখে বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে অন্যমনস্কভাবে হস্তস্থিত ছুরি দ্বারা ফলের পরিবর্তে নিজেদের হাতটা কেটে বসলো। অথবা এই বাক্য মহিলাদের বিস্ময়াভিভূত হওয়ার অবস্থার চিত্রাংকণ বলা যেতে যারে। আরবী বাগ্‌ধারায় 'আয্‌যুল আনামেলে' (অর্থ দাঁতে আঙ্গুল কাটা) বিস্ময় বা হতবাক প্রাকাশার্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং যেহেতু কোন কোন সময় বস্তুর নাম উহার অংশবিশেষকেও বুঝায়, সেহেতু এখানে হাত শব্দ দ্বারাও হাতের আঙ্গুল বুঝায়। তালমুদ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: মেহমানদের কমলা লেবু দেয়া হয়েছিল এবং তারা (মহিলারা) যোসেফের (হযরত ইউসুফ আ.) প্রতি তাকিয়ে সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত হয়ে গেল এবং অন্যমনস্ক হয়ে তাদের অনেকে নিজের হাতের আঙ্গুল কেটে বসলো (যিউ এনসাইক ও তালমুদ)।

* ['ক'ত্তা'না আয়দিয়া হুন্না (অর্থাৎ তারা তাদের হাত কেটে ফেললো) শব্দগুলো যেভাবে কুরআন করীমে ব্যবহার করা হয়েছে এর আক্ষরিক বা রূপক অর্থ করা যেতে পারে বলে হযরত ইমাম রাগেব (রহ.) মত ব্যক্ত করেছেন। এ স্থলে এ শব্দগুলোর আক্ষরিক অর্থ হবে, ধারাল কোন অস্ত্রের মাধ্যমে হাত কেটে ফেলা বলা বাহুল্য আল কুরআন নিশ্চয় এ অর্থে শব্দগুলো ব্যবহার করেনি। আর ঘটনার প্রেক্ষিতে এ ধরনের অবস্থাও অচিন্তনীয়। এ অর্থের বিকল্পরূপে কোন কোন কুরআন বিশারদ 'হাত কাটার ক্রিয়াটিকে সামান্য অল্পক্ষত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শব্দগুলোর আভিধানিক ব্যবহার কখনো এ কথাকে সমর্থন করে না। অতএব আক্ষরিক বা রূপক উভয় অর্থের কেবল একটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের বিবেচনায় এ প্রেক্ষাপটে শব্দগুলোর রূপক অর্থ নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ প্রকাশভঙ্গীর অর্থ হলো, তাঁরা তাকে তাদের নাগালের বাইরে মনে করলো এবং নিজেদের পরাজয় মেনে নিল। (মওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

হাদীস শরীফ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ

কুরআন ঃ

"নিশ্চয় তোমাদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যে আল্লাহ্‌র ও পরকালের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে অনেক বেশী স্মরণ করে"।

(সূরা আল আহযাব : ২২)

হাদীস ঃ

* হযরত আমের (রা.) অত্যন্ত পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে, জিজ্ঞাসা করলেন, "হে উম্মুল মু'মিনীন। আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন।" "হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তুমি কি কুরআন পড় নাই?" হযরত আমের (রা.) বললেন, "কেন (পড়ব) না" তিনি বললেন, "হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর চরিত্র তো কুরআনই ছিল" (নিসাঈ)।

> *"আমার আগমনের উদ্দেশ্য উত্তম চরিত্র-আদর্শের পূর্ণতা দান করা"*

* হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, "হযরত রাসূল করীম (সা.) মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন" (মুসলিম)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমার আগমনের উদ্দেশ্য উত্তম চরিত্র-আদর্শের পূর্ণতা দান করা" (আল আদাবুল মুফরাদ)।

* হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) বলেছেন, "নবী করীম (সা.) প্রকৃতিগতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না" (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর আদর্শ সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, "কুরআন শরীফে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর উত্তম চরিত্রের যে, উল্লেখ রয়েছে তা হযরত মূসা (আ.) অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম। কারণ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর মধ্যে সেই সব উত্তম চরিত্র গুণ একত্র হয়েছে যেগুলি বিভিন্ন নবীর মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় ছিল।

আল্লাহ্ তাআলা আঁ-হযরত (সা.) সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন, 'ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম' অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর দন্ডায়মান আছ। 'আযীম' শব্দটি দ্বারা যখন কোন বস্তুর তা'রীফ করা হয় তখন আরবী বাকধারায় তা দ্বারা ঐ বস্তুর চরম ও পরম কামালিয়াত (পূর্ণতা) বুঝায়।

মানবাত্মার মধ্যে যত উত্তম চারিত্রিক গুণ ও মধুর আচরণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব, ঐ সব চারিত্রিক গুণ পূর্ণ মাত্রায় মুহাম্মদীয় সত্ত্বায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাঁর এই তা'রীফ এত উচ্চাঙ্গের যে, এর চেয়ে অধিক তা'রীফ সম্ভব নয়"।

(বারাহীনে আহমদীয়া)

অমৃতবাণী

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান্নাবীঈন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

'আমাদের নেতা ও প্রভু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদা তাআলার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে উম্মতি বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক বিশেষ এই গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি-খাতামুন্নাবীঈন। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবুওয়াতের সমস্ত পূর্ণতা উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,- তাঁর (সা.) পরে আর নতুন শরীয়তওয়ালা কোন রাসূল নেই; এবং তার (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মত বহির্ভূত।

বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি খোদা তাআলার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিল বা সরাসরি নবী নন। তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ অন্তত:পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দন্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ! যারা দিগ্বজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি তাঁর ওপরে খোদা তাআলার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই। তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি।

তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়াত কি জিনিষ। এছাড়া, মোজেজা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী সাহায্য। আমরা কি বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই কারণে আমাদের ওপরে প্রকাশিত হয়েছে।' (চশমা মারেফাত, পৃ ৮-১০)

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৭ ডিসেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহ্হুদ তাআউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়তের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরিফে বলেছেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

অনুবাদঃ মু'মিনরা আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। (সূরা আল্ বাকারা, ১৬৬)। এটাও আল্লাহ্রই ভালবাসা যা ধাপে ধাপে আল্লাহ্র প্রিয়জনদের প্রতি ভালবাসায় রুপ নেয়। এবং এরা আল্লাহ্র ভালবাসা লাভের চেষ্টা করে। তারা চেষ্টা করে কিভাবে তারা প্রিয়জনের ভালবাসা লাভ করবে।

হাদীসে আছে, যেদিন আল্লাহ্র রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের ছায়ার মধ্যে নিবেন। তাদের মধ্যে ঐ দুজনও থাকবে যারা আল্লাহ্র খাতিরে পরস্পর একে অপরকে ভালবাসেন। (বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, হাদীস নং ৬৬০)

আল্লাহ্র খাতিরে তাদের এই ভালবাসা আল্লাহ্র সাথে তাদের সবচেয়ে বেশী ভালবাসারই বহি:প্রকাশ। অতএব, সাধারন মু'মিনা যারা একে অপরকে আল্লাহ্র খাতিরে ভালবাসেন তাদেরকেই যদি আল্লাহ্ এতবেশী প্রতিদান দেন, তবে আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রাসূলকে যারা ভালবাসে তাদেরকে আল্লাহ্ কতই না বেশী প্রতিদান দিবেন! তা অনুমানও করা যায় না। প্রেম ভালবাসার এ এক অপূর্ব দৃশ্য! যার শেষ প্রান্তে আল্লাহ্ তাআলার সত্ত্বা। কত ভাগ্যবান ঐ সব মানুষ যারা নিজেদের প্রেম ভালবাসার ও বিশ্বস্ততার নমুনা দেখাবার জন্য আল্লাহ্র নবী বা প্রেরিতদের যুগ পেয়ে থাকেন। আমাদের কারো কারো বাপ-দাদারা পূর্ব পুরুষরা এমন নমুনা দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুগ পেয়েছেন। তারা সরাসরি হযরত (আ.) এর সাথে প্রেম-ভালবাসা; সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন। এবং তারা হযরত (আ.) এর ভালবাসাও লাভ করেছেন। আজ এমনই কয়েকজন ভাগ্যবান বুযূর্গগণের রেওয়ায়াত ও ঘটনাবলী উল্লেখ করতে চাই। কত ভাগ্যবান ছিলেন তারা, হযরত (আ.) এর হাতগুলো ছুঁয়েছিলেন, সরাসরি হযরত (আ.) এর থেকে বরকত লাভ করেছিলেন।

আমি যেসব রেওয়ায়াত বর্ণনার জন্য এনেছি তার মধ্যে প্রথম রেওয়ায়াত হযরত ওলীদাদ খান (রা:), যিনি বংশে রাজপুত ছিলেন। তার পিতার নাম লাল খান, গ্রাম মরাড়া তহসীল নারোয়াল জেলা শিয়ালকোট।

তিনি বলেছেন, আমি ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে জলসা সালানার সময় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছিলাম। জলসার একদিন পূর্বে কাদিয়ান পৌঁছে গিয়েছিলাম। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সকালে বাসভবনের বাইরে আসবেন, এজন্য মসজিদ মোবারকের বাইরে অনেক মানুষের ভীড় দেখলাম। সবাই ভীড় করছে একে অন্যের উপর হুমড়ি খাচ্ছে। আমি নবাগত ছিলাম– অন্য এক গলির মুখে দাঁড়িয়েছিলাম।

দোয়া করতে থাকলাম যেন, হুযূর এ দিকে আসেন আর আমি প্রথমে হুযূরের সাথে করমর্দন করতে পারি। তখনই দেখলাম, হুযূর (আ.) হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদসহ ঐ পথেই আসছেন। আমার মনে হল, মেঘের ভেতর থেকে যেন হঠাৎ সূর্য বেরিয়ে এল, চারিদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ল। আমি ছুটে গিয়ে হুযূরের হাত ধরে মুসাফা (করমর্দন)-এর সুযোগ নিলাম। হুযূর (আ.) আরিয়াদের বাজারের রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

আমার মনে পড়ে হুযূর (আ.) নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের বাগানের উত্তর পাশ দিয়ে ঘুরে ফেরত আসলেন। সম্ভবত; মসজিদ নূর অথবা মাদ্রাসা আহমদীয়ার পশ্চিম সীমানায় হুযূর বসলেন। সাহাবা কেরাম আশেপাশে জড়ো হয়ে বসলেন। মীর হামেদ আলী মরহুম শিয়ালকোটী স্ব-রচিত নযম পড়ে শোনালেন।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ৮৪)

তারপর হযরত মদদ খান সাহেব (রা.) ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল কাদিয়ান, পিতা রাজা ফতেহ মোহাম্মদ খান ইয়াড়িপুরা কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। হযরত মদদ খান সাহেব ১৮৯৬ সনে পত্রের মাধ্যমে বয়আত করেছিলেন এবং ১৯০৪ সনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, একবার রমযানে মনে আগ্রহ সৃষ্টি হল যে, কাদিয়ানে গিয়ে রোযা রাখব এবং ঈদও সেখানেই করব। তারপর চাকুরীস্থলে গিয়ে হাজির হব। সে সময় আমি সেনাবাহিনীতে জামাদার পদে নতুন নতুন ভর্তি হয়েছিলাম মাত্র। [হুযূর (আই.) বলেন, সম্ভবত আজকাল এই পদ নাই। তবে এটি জুনিয়র কমিশন অফিসারের পদ ছিল বলে আমার ধারনা।]

আমার ইচ্ছা হয়েছিল, আমি চাকুরী আরম্ভ করার পূর্বে কাদিয়ান হয়ে হযরত আকদাস (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর পবিত্র চেহারা দেখার সৌভাগ্য লাভ করবো এবং পুণরায় হুযূর (আ.) এর হাতে বয়আতের সুযোগ নিব। কারণ ইতিপূর্বে ১৮৯৫/৯৬ সালে পত্র যোগে বয়আত করেছিলাম। অতএব, এটা আমার প্রথমবার কাদিয়ান যাত্রা ছিল। আমার মনে আবেগ ছিল, অবশ্যই হুযূর (আ.) এর সাথে সাক্ষাৎ করবো। কারণ চাকুরীতে যোগ দেয়ার পর সাক্ষাতের সুযোগ হয় কি না হয়।

সুতরাং আমি কাদিয়ান গিয়ে হযরত (আ.) এর সাক্ষাতের পর ফেরত এসে তারপর চাকুরীতে যোগ দেয়ার উদ্দ্যোগ নিলাম। কাদিয়ান এসেছিলাম ঐ রকম চিন্তা করে। কিন্তু কাদিয়ানে এসে যখন হযরত (আ.) এর পবিত্র চেহারা দেখলাম সাথে সাথে আমার অন্তরের অবস্থা এমন হোল যে, আমি মনে করলাম, আমাকে যদি পুরো কাশ্মির রাজ্য দিয়ে দেয়া হয় তবুও আমি হুযূর (আ.) কে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। হযরত (আ.) এর আকর্ষন এতো শক্তিশালী ছিল যে, আমি কাদিয়ান ছেড়ে যাবার মনোবল হারিয়ে ফেলছিলাম। হযরত (আ.) এর আকর্ষন আমাকে কাদিয়ান না ছেড়ে যেতে বাধ্য করলো। হযরত (আ.) কে দেখার পর আমার মনে হলো, কাদিয়ান ছেড়ে গিয়ে যদি আমার বেতন হাজার টাকাও হয় তো কী হবে? কিন্তু কাদিয়ান ছেড়ে গেলেতো হুযূরের পবিত্র চেহারা দেখতে পাব না! শেষে, কাদিয়ান ছেড়ে দেশে যাওয়ার ইচ্ছা আমি পরিত্যাগ করলাম। আমার মনে হলো কাদিয়ানে আমি মারা গেলে তো হুযূর আমার জানাযা পড়াবেন এবং এতে করে আমি পার পেয়ে যাব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবো।

কাদিয়ানে অবস্থান করার ইচ্ছা দৃঢ় করার পর প্রতিদিন আমি দোয়ার জন্য হুযূর (আ.) এর কাছে লিখতে শুরু করলাম। দোয়ার জন্য পত্র লিখে, খামে ভরে প্রতিদিন হুযূরের দরজায় যেতাম। কারো হাতে ভেতরে পাঠাতাম। অন্তরে ভয়ও হতে লাগল। হুযূর (আ.) বিরক্ত হন কিনা তা তো জানি না। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। একদিন হুযূর (আ.) এর লেখা পত্র পেলাম। হুযুর লিখেছেন, তুমি এটি ভাল পথ অবলম্বন করেছো। আমাকে দোয়ার জন্য স্মরণ করাতে থাকো। আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবো। আল্লাহ তোমাকে সাংসারিক ও ধর্মীয় জীবনে সাফল্য দিবেন। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। খোদা তাআলা নিজেই তোমার বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিবেন। আমাকে স্মরণ করাতে থাকো।

আমি তোমার প্রতি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তিনি (আ.) আরো লিখেছেন, হযরত আকদাস (আ.) এর পত্র পেয়ে আমি শেখ গোলাম আহমদ সাহেব নও-মুসলিমকে দেখালাম যে, আজ হুযূর (আ.) এর পত্রখানা পেয়েছি। বললাম, আমিতো হুযূর (আ.) কে কখনও আমার বিয়ে সর্ম্পকে ইশারাও করি নি। শেখ সাহেব হেঁসে বললেন, এখনতো তোমার বিয়ে শিঘ্রই হয়ে যাবে। কারণ হুযূর (আ.) এর কথা কখনো বিফল হয় না। নিজেকে প্রস্তুত করুন।

লিখেছেন, দু মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল। পূর্বে আর কোথাও আমার বিয়ে হয়নি। আমার দুটি বিয়ে হুযূর (আ.) নিজেই করিয়েছিলেন। নয়তো আমার মত বহিরাগতকে কে বিয়ে দিত! হুযূর (আ.) এর পক্ষ থেকে এটি আমার জন্য সবিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একান্তই দয়াপরবশ হয়ে হুযূর (আ.) আমার বিয়েগুলো করিয়েছিলেন। কতই না তুচ্ছ আমি আর আমার সাথে এ কেমন ব্যবহার! (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৪, পৃ; ৯৫-৯৭)

হযরত মাষ্টার মোহাম্মদ পিরেল সাহেব, কামালডেরা, সিন্ধু লিখেছেন,

"আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দ; বিনীত এ বান্দা আল্লাহর ফযলে জুলাই ১৯০৫ সালে হযরত জারিউল্লাহ ফী হোলালিল আম্বিয়া (আ.) এর হাতে বয়আত গ্রহন করেছিলাম।

সে যুগে মসজিদ মোবারক খুব ছোট ছিল, চার পাঁচ ব্যক্তি বসলেই জায়গা ভরে যেত। সে সময় জুলাই মাসে খুব গরম পড়েছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যখন মসজিদে বসতেন, আমি হুযূরের নিকটে বসে পাখা চালাতাম। মসজিদের উপরে মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেবের দফতর ছিল। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব একদিন হুযূর কে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। তিনি হুযূর (আ.) এর নিকটে বসে কথা বলতে চেয়েছিলেন। তিনি আমাকে ইশারা করছিলেন যেন আমি সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দেই।

আমি যেতে উদ্দ্যত হলাম। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাকে বললেন, 'সরবে না'। যেমন বসে আছো বসে থাক। আমি সরে না গিয়ে পাখা হাকাতে থাকলাম। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুযূরের সাথে কথা বললেন। হুযুর জবাব দিলেন। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব লিখে নিয়ে চলে গেলেন। ঐ যুগে তো এ বিষয়ে কিছু মনে হয় নি। এখন মনে হলে বড় আনন্দ বোধ করি। কারণ আমি অতি সাধারন মানুষ, উর্দূও ভাল বুঝি না। মৌলবী মোহাম্মদ আলী সাহেব এম, এ পাশ শিক্ষিত, বড় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর নবীর দৃষ্টিতে ছোট বড় সবাই সমান ছিল। এ অধম প্রায় ১৫ দিন কাদিয়ানে অবস্থান করেছিলাম। প্রতিদিন হযরত (আ.) এর নূরানী চেহারা দেখতাম। আমার মনে হতো হুযূর (আ.) এই মাত্র গোসল করে এসেছেন। মাথার চুল ঘাড়ের উপর এসে থাকতো। মনে হতো যেমন চুল থেকে ফোটা ফোটা মতি ঝরছে। হযরত (আ.) সর্বদা

হাসিখুশি থাকতেন। কখনও দু:খ ভারাক্রান্ত মনে হতো না।

হযরত চৌধুরী আব্দুল হাকীম পিতা চৌধুরী শরফুদ্দীন সাহেব জেলা গুজরাঁ ওয়ালা লিখেছেন, ১৯০২ সনের গরম কালের কথা। আমি তখন মুলতান সেনানিবাস রেল ষ্টেশনে সিগনাল ম্যান হিসাবে চাকরী করতাম। আহলে হাদীস মত পোষন করতাম। মৌলভী আব্দুল জব্বার ও আব্দুল গাফ্‌ফার দুই ভাই ছিলেন। মুলতান শহরের দূর্গের পাশে বইয়ের দোকান ছিল। আমি তাদের থেকে কুরআনের অনুবাদ পড়তাম। একদিন ঘটনাক্রমে মৌলভী বদর উদ্দীন আহমদীর সাথে দেখা হয়ে গেল, যিনি একটি স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। তিনি আমাকে আল হাকাম পত্রিকা পড়তে দিলেন। ঐ পত্রিকার প্রথম পাতায় লেখা ছিল। 'আল্লাহ্ তাআলার তাজা ঐশী বাণী ও যুগ ইমামের পবিত্র বাণী' এগুলোকে পড়ে আমার অন্তরে এমন প্রেম ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গেল যেমন এখনই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খেদমতে হাজির হই।

আল্লাহ্‌র ফযলে আহলে হাদীস মৌলভীদের বিরোধীতা সত্বেও আমি শিঘ্রই আহমদী হয়ে গেলাম। মৌলভী বদরউদ্দীন সাহেব আমাকে কাদীয়ান যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমার সাথে যাবার জন্য একজন আহলে হাদীসের মৌলভী সাহেবও আমার সাথে প্রস্তুত হোল। আহলে হাদীসের সে মৌলভী সুলতান মাহমুদ সাহেবের খাস শিষ্য। আমরা খুব গরীব মানুষ ছিলাম। আমার বেতন-পনের টাকা নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। রেলের কোন পাশ পাওয়ার অধিকার ছিল না।

অমৃতসরের টিকেট কিনে গাড়ীতে বসে গেলাম। অমৃতসর পৌঁছে আমাদের টিকেট শেষ হোল। বাটালা পর্যন্ত টিকেটের টাকা ছিল না। মাত্র আট আনা ছিল হাতে। দুই-দুই আনার টিকেট নিয়ে গাড়ীতে বসে গেলাম। সারাক্ষণ ভয় হচ্ছিল টিকেট চেকার জিজ্ঞাসা করলে অপমানিত হতে হবে। টিকেট চেকার আসলেন, আমাদের টিকেট চেক করলেন। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। টিকেট ভাল করে দেখে টিকেট আমাদের ফেরত দিয়ে চলে গেলেন। বাটালা এসে নেমে স্টেশনের বাইরে যাবার গেটেও টিকেট চেক হোল এখানেও আমাদের টিকেট দেখে আমাদেরকে কিছু বলল না। আমরা দোয়া করে যাচ্ছিলাম। প্রথম অলৌকিক সাহায্য এটা দেখলাম, আমাদের অপমানিত হতে হয় নি। আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল। অবশেষে বাটালা থেকে হেঁটে কাদিয়ান পৌঁছে গেলাম। আমরা যখন মসজিদে মোবারক পৌঁছলাম তখন হযরত (আ.) আসলেন। হযরত (আ:) দেখেই আমার সাথী আহলে হাদীসের মৌলভী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কুরআন-হাদীস আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য তো আছেই তাহলে বয়আতের কি প্রয়োজন? হযরত সাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি আমার সাথী বললেন, আমার আর কোন প্রশ্ন নাই আমি বয়আত করতে চাই। হযরত বললেন, আরো অপেক্ষা করুন, পুরোপুরি নিশ্চিত হোন; ধোকা যেন না খান। নামায যোহর পড়ে হযরত ভেতরে চলে গেলেন। হযরতের বক্তৃতা শেষে হযরত মৌলভী আব্দুল করিম শিয়ালকোটী সাহেব বললেন, আমাদের কাগজ গুলোতে এসব কথা লেখা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্ন করার তো কোন প্রয়োজন ছিল না যে কুরআন হাদীসের উপস্থিতিতে বয়আতের কি প্রয়োজন? মৌলভী সাহেব বললেন বাহির থেকে এসে লোকেরা এভাবে প্রশ্ন করে হযরত সাহেবকে কষ্ট দেয়, পত্রিকা পড়ে না। হযরত সাহেব বললেন, মৌলভী সাহেব! বক্তৃতা করি আমি আর কষ্ট হয় আপনার! হযরত সাহেব যে কোন লোকের প্রশ্নের উত্তর খুব সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করতেন। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ১২১-১২৪)

গুজরাঁ ওয়ালা জেলার হযরত চৌধুরী আব্দুল হাকিম পিতা চৌধুরী শরফ উদ্দীন সাহেব লিখেছেন, যেদিন সন্ধ্যায় আমি হযরতের (আ.) হাতে বয়আত করেছিলাম, হযরতের ভিতর চলে যাবার পর আমি মৌলভী নূরুদ্দীন এর কাছে গেলাম, তিনি মসজিদেরই একটি কামরায় থাকতেন। মৌলভী সাহেব একটি ছোট্ট চারপাই ছাদের উপর লাগিয়ে রেখেছিলেন। তার কাছে অনেকক্ষন থেকেছিলাম। অনেক কথা তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম। একটি কথা ছাড়া কোন কথা আমার স্মরণ নাই। মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব বলেছিলেন, লোকেরা বলে যে নূরুদ্দীন নাকি জাগতিক উপার্জনের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে। এখানে তো ঐ চারপাই খানা পেয়েছি যার উপর আমার শরীরের অর্ধেক মাত্র সঙ্কুলান হয়। আমি তো কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে এসেছি। হযরতের বয়আত করে সেটা আমি পেয়ে গেছি। যে খোদাকে পাওয়ার জন্য এসেছিলাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করে তা আমি পেয়ে গেছি।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ১২৫)

এটাই সেই সম্মান যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার এক পংক্তিতে উল্লেখ করেছেন।

چہ خوش بودے اگر ہر یک زامت نور دیں بودے
ہمیں بودے اگر ہر دل پر ازنور یقیں بودے

"কতই না খুশীর কথা যদি এ উম্মতের প্রত্যেকে নূরুদ্দীন হোত। এটা তখনই হতে পারে যখন প্রত্যেকের হৃদয় দৃঢ় ঈমানের নূরে পরিপূর্ণ হবে।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর দাবীর প্রতি যদি পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, তাহলে হযরত নূরউদ্দীন (রা.) এর মত মর্যাদা লাভ করা যেতে পারে।

হযরত হামেদ হোসেন খান সাহেব পিতা মোহাম্মদ হোসেন খান মুরাদাবাদ লিখেছেন, "আমি ১৯০২ সনে আলীগড় থেকে মীরাঠে এসে চাকুরী শুরু করেছিলাম।

এখানে আমার চাকুরী লাভের কিছুকাল পরে মুকাররাম খান সাহেব যুলফিকার আলী খান সাহেবও মীরাঠে বদলি হয়ে এলেন পানি সরবরাহ বিভাগের ইন্সপেক্টর হয়ে। তিনি আহমদী ছিলেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করেছিলেন। তার বাসভবনে ধর্মীয় আলোচনার আসর বসতো।

শেখ আব্দুর রহিম খান সাহেব, রংসাজ সদর বাজার মীরাঠ ক্যাম্প, মৌলভী আব্দুর রহিম প্রমুখগণ খান সাহেবের বাস ভবনে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। খান সাহেবের সাথে আমারও আলীগড়ের শিক্ষা লাভের কারণে আন্তরিক ভালবাসার সর্ম্পক ছিল, তাই আমারও আসা যাওয়া আরম্ভ হয়ে গেল। আমি বই পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করাতে

খান সাহেব আমাকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর ছোট ছোট বইগুলো পড়তে দিতে থাকেন। সম্ভবত; বারকাতুদ দোয়া সর্বপ্রথম পড়ার সুযোগ হলো আমার । অন্যান্য বইও ছিল। আমি পড়তে আরম্ভ করলাম।

একবার মৌলবী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব খান সাহেবের বাসায় এসেছিলেন। মীরাঠে মুনাজেরা (ধর্মীয় বিতর্ক সভা)-এর জন্য এসেছিলেন। সে সময় আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু। দুষ্ট লোকদের কারণে মীরাঠে কোন তর্ক-সভা হোল না। তবে মৌলভী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেবের বক্তৃতা আমি শুনেছিলাম। মীরাঠের লোকদের সাথে ধর্মীয় তর্ক-সভা নিয়ে যে ঝগড়া হয়েছিল, শুনেছি পৃথক আকারে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

এ ঘটনার পর আমার মনে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি হল। আমি খান সাহেবকে বললাম, হযরত সাহেব যদি মীরাঠের আশে পাশে কোথাও আসেন তাহলে আমাকে জানাবেন। এমন একজন মহান ব্যক্তিকে আমি দেখতে চাই। যদি না দেখতে পারি তাহলে এটা আমার দুর্ভাগ্য হবে। তখন বয়আত করার কথা আমার মনে হয় নি।

তারপর ১৯০৪ ইং সালে বড় বিধ্বংসী এক ভূমিকম্প হয়ে গেল। বলা হলো যে, হযরত সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এ ভূমিকম্প হয়েছে। তারপর একদিন খান সাহেব বললেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দিল্লী আসবেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাক্ষাতের জন্য আপনিও চলুন। আমিও আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং আমরা দিল্লী চলে আসলাম।

দিল্লীতে হযরত আকদাস (আ.) চান্দলি কবর মহল্লার আলিফ খার হাভেলীতে অবস্থান করলেন। আমি এবং খান সাহেব যুলফিকার আলী খান রেল যোগে দিল্লী গেলাম। তখন প্রায় দুপুর ১২টা বা ১টা হবে। হযরত সাহেব তার গৃহের উপর তলায় অবস্থান করছিলেন। নিচের তলায় অন্যান্যরা। বাড়ীতে প্রবেশ করে আমার দৃষ্টি প্রথমে হযরত মৌলভী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেবের উপর পড়ল। কারণ তাকে আমি জানতাম। আমি তার কাছে বসে কথা বলছিলাম। কিছুক্ষন পরে খান সাহেব যিনি বারান্দায় বসা ছিলেন আমাকে তার কাছে ডাকলেন। উপরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) অবস্থান করছিলেন। আমি একটি চারপাইয়ের পইথানের দিকে বসলাম। কথা বলছিলাম।

আমি যেখানে বসে ছিলাম সাথেই উপরে যাবার সিড়ি ছিল। এমন সময় হযরত (আ.) ঐ সিড়ি বেয়ে উপর থেকে নিচে নেমে আসলেন। সেদিকে আমার পিঠ ছিল। অতএব আমি তাঁকে দেখিনি।

হযরত সাহেব আস্তে-আস্তে এসে আমার সামনের চারপাইয়ের উপর বসলেন। কোন শব্দ ছিল না। সে সময় হযরত সাহেবকে চিনে এমন কেউ সেখানে ছিল না। আমিও চিনতাম না। কেউ আমাকে ডাকছিলেন যে, হুযূর এসেছেন। আমি কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠতে চাইলাম। কিন্তু হযরত সাহেব ইশারা করলেন, যেন এখানেই আমি বসে থাকি। হুযূর খুব অনাড়ম্বর সহজ সরল ছিলেন। আমার স্মরণ নাই যে, হুযূর আমাকে ইশারা করছিলেন অথবা আমার বাহু ধরে বসিয়েছিলেন।

হযরত সাহেবের আসার পর যারা সেখানে ছিলেন সবাই খবর পেয়ে গেলেন যে হুযূর এখানে এসেছেন। বাড়ীটা সরগরম হয়ে উঠল। আমার মনে পড়ে, খান সাহেব হুযূরকে জানালেন আমার সর্ম্পকে যে, আমরা মীরাঠ থেকে এসেছি। বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তা হতে থাকল। কিছু সময় পরই যোহর ও আসরের নামায আদায় করা হল। নামায শেষে হযরত (আ.) বললেন, যারা বয়আত করতে চান তারা এগিয়ে আসুন। তারপর একজন ব্যক্তি এ কথাটি জোরে জোরে বললেন। তারপর অনেকেই সামনে এগিয়ে গেলেন– আমি সবার পিছনে রইলাম। বয়আত আরম্ভের পূর্বে হযরত সাহেব বললেন, যারা আমার কাছে আসতে পারছেন না তারা তাদের সামনের যিনি বয়আত করছেন তার পিঠে হাত রেখে বয়আতের কথাগুলো উচ্চারণ করুন। তবুও আমি পেছনে চুপ করে বসে থাকলাম। কারণ বয়আতের ইচ্ছা ছিল না, তাই হাত কারো পিঠে রাখলাম না। যখন হযরত সাহেব বয়আত আরম্ভ করলেন তখন আমার হাত আমার ইচ্ছা ছাড়া আপনা থেকেই উঠে গেল এবং সামনের যিনি ছিলেন তার পিঠে হাত রাখলাম। আমিও বয়আতের কথাগুলো বলতে লাগলাম। অথচ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত উঠে গিয়েছিল। যখন হুযূর (আ.) বললেন, রাব্বি ইন্নি যালামতু নাফসি ওয়া তারাফতু বিযানবি ফাগফিরলি যুনুবি ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা" সবাই তা বললেন। আমিও তাদের সাথে তা বললাম। তারপর যখন হুযূর (আ.) উর্দ্দূতে এর অনুবাদ বললেন তখনও হুযূর বললেন যে, তোমরাও উচ্চারণ কর। আমিও উচ্চারন করলাম। কিন্তু নিজের গুনাহর কথা ভেবে আমি ভয়ে কাঁদতে লাগলাম। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

আমি কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। আমি জানলাম না যে, কী হচ্ছে! কিছু সময় পার হলে হুযূর বললেন পানি আন। পানি আনা হলে হুযূর পানিতে কিছু পাঠ করে দেবার পর আমার উপর ছিটালেন। এ সব কথা পরবর্তিতে খান সাহেব আমাকে বলেছিলেন।

হ্যাঁ, আমার স্মরণ আছে যে, আমি অজ্ঞান অবস্থায় দেখলাম বিভিন্ন রঙের নূরের খুঁটি আকাশ থেকে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর কেউ আমাকে মেঝে থেকে তুলে বসালেন। আমি উঠে বসলাম। কিন্তু আমার অশ্রু ঝরা থামছিল না। পরিস্থিতি এতটাই পালটে গেল যে, আমি মিরাঠে এসেও বারবার কাঁদতে থাকলাম। উল্লেখিত খাঁন সাহেব আমার নামে 'বদর' ও 'রিভিও' পাঠাতে শুরু করলেন। 'বদর'-এ হযরত আকদাসের পবিত্র ওহী প্রকাশিত হতো। এর সাথে খুব ভালবাসা সৃষ্টি হল।

সর্বদা মনে হতো, তাজা ওহী সম্পর্কে আমি যেন সর্বাগ্রে জানতে পারি। পরবর্তীতে দারুল আমানে জলসায় যেতে লাগলাম এবং প্রতি বারই যেতাম। হুযুর আকদাসের কাছে দোয়ার আবেদন করে চিঠি লিখতাম। একটি চিঠির উত্তর তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পবিত্র হাতে লিখেছিলেন। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও সেই চিঠিটি আমার কাছে ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সেটি হারিয়ে গিয়েছে।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩ পৃ; ৬৩-৬৭)

হযরত মিস্ত্রী আল্লাহ্ দিত্তা (রা.), তাঁর পিতার নাম- সাদার দীন সাহেব। তিনি গুরুদাস পুর জেলার ভাম্বড়ি-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮৯৪ইং সালে বয়আত করেন এবং একই বছর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, আমার শিক্ষকের নাম ছিল, মেহেরুল্লাহ্। তার কাছ থেকে আমি কুরআন শরীফ পাঠ করতে শিখি। তিনি বলতেন, খুব শীঘ্রই ইমাম মাহাদী আবির্ভূত হবেন আর তিনি আবির্ভূত হলে তাঁর হাতে বয়আত নিও। কাজেই যখন আমি শুনি, কাদিয়ানে ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়েছেন তখন আমি আমার সেই শিক্ষক মেহেরুল্লাহ্ সাহেবের কথা মত বয়আত নিই।

এরপর থেকে সর্বদাই আমি ভাম্বড়ি থেকে কাদিয়ান এসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে জুমুআর নামায পড়তাম। হুযুর আকদাস (আ.) বলতেন, তোমাদের কাছে আমার বন্ধুরা আসলে তাদের আদর-যত্ন করো। মাস্টার আব্দুর রহমান ভাম্বড়ি সাহেব আমাদের এখানে যেতেন এবং মুফতি ফযলুর রহমান সাহেবও কখনো কখনো যেতেন। তিনি (রা.) বলেন, অনেক বার আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে বলতে শুনেছি, আমাদের জামাত সত্য।

ইনশাআল্লাহ্, এর পতন ঘটবে না। মিথ্যা অল্প দিন থাকে কিন্তু সত্য সদা বিরাজমান। ভূ-স্বামী কতিপয় মেহমান কাদিয়ানে এসেছিলেন। তখন গ্রীষ্ম কাল ছিল। হুযুর (আ.) সকাল আটটার দিকে বাবুর্চীকে বললেন, তাদের জন্য কিছু খাবরের ব্যবস্থা কর। বাবুর্চী বলল, হুযুর রাতের বেচে যাওয়া কিছু বাসি রুটি আছে। হুযুর বললেন, কোন সমস্যা নেই নিয়ে আস। কাজেই বাসি রুটি আনা হল। হুযুর (আ.) এবং মেহমানগণ খেলেন। সম্ভবত সেই মেহমানরা তাদের গ্রাম আঠওয়াল ফিরে যচ্ছিলেন, এমন সময় হুযুর (আ.) বললেন, বাসি খাওয়া সুন্নত। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৪, পৃ; ১০৬)

গুজরাঁওয়ালার এক জনবসতি চাহরোডার আহাম্মদ পুর মহল্লার অধিবাসী মিয়া শরাফ উদ্দীন সাহেব দর্জির পুত্র হযরত মীরা বখ্‌শ সাহেব লিখেন, এ অধম সম্ভবতঃ ১৮৯৭ বা ১৮৯৮ইং সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত গ্রহণ করি। কিন্তু আমি আমার পিতার কাছে কিছু দিন পর্যন্ত এ কথাটি প্রকাশ করি নি। এ সব বিষয় কত দিন আর গোপন থাকে? শেষ পর্যন্ত বিষয়টি জানাজানি হলে আমার পিতা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। আর আমিও রিয্‌কদাতা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আলাদা একটি দোকান ভাড়া নিই। হাত খাটো থাকলেও মনে খুব ইচ্ছা ছিল, যে করেই হোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পোষাক স্বহস্তে শেলাই করে উপহার দিব। এই মানসে আমি মসলিনের একটি কুর্তা, লেঠা কাপড়ের সেলওয়ার, কাল রং-এর কোর্ট এবং মসলিনের একটি পাগড়ী কিনে স্বহস্তে শেলাই করে পোশাক তৈরী করলাম। পরে এর-ওর কাছ থেকে কাদিয়ানের গাড়ি ভাড়া যোগাড় করে কাদিয়ানে পৌঁছলাম। পরের দিন ছিল জুমুআর দিন। তাই আশা করছিলাম, আজই যদি হুযূর (আ.)-কে এ নগন্য ও সাদামাটা উপহার সামগ্রী দিতে পারতাম তবে হুযূর হয়তো জুমুআর নামাযের পূর্বেই এগুলো পড়ে এ অধমকে খুশি করতেন।

এ কথা ভাবতে ভাবতেই কাজী জিয়া উদ্দীন সাহেবের দোকানে পৌঁছলাম এবং তাঁর কাছে মনের এই আকাঙ্খার কথা ব্যক্ত করলাম। এ কথা শোনা মাত্রই তিনি বললেন, চল মিয়া! আমি তোমাকে হুযুর (আ.) এর কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তখনই তিনি আমাকে হযরত আকদাস (আ.)এর কাছে নিয়ে গেলেন।

হুযূর (আ.) তখন চৌকিতে বসে কিছু একটা লিখছিলেন। আর খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব চৌকির পাশে চাটাইয়ের ওপর বসেছিলেন। আমরা দু'জনও গিয়ে খাজা সাহেবের পাশে বসে পড়লাম। খাজা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কি মনে করে আসলেন? কাজী সাহেব আমার আকাঙ্খার কথা ব্যক্ত করলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে খাজা সাহেব আমাকে সম্বোধন করে বললেন, কোন সমস্যা নেই! আমি তোমার কাজ করে দিব। আমি বললাম, এটা তো আমার জন্য অনেক বড় অনুগ্রহ হবে। এ কথা শুনে খাজা সাহেব আমার কাছ থেকে কাপড় গুলো নিয়ে হুযূর (আ.)-কে দিলেন এবং বললেন, এ ছেলেটির আকাঙ্খা, আপনি যদি এ কাপড় পড়ে জুমুআর নামায পড়তেন! খাজা সাহেবের এ কথা শোনামাত্র হুযুর (আ.) কাপড় গুলো পরতে শুরু করলেন। (কাপড় পরার অর্থ তখনই দেখা শুরু করলেন) কোর্টটি পরার পর দেখা গেল এটি তাঁর গায়ে একটু আটোসাটো হয়। আমি বললাম, হুযূর! কোর্টটি খুব আটোসাটো, খুলে দিন আমি এটাকে খুলে কিছুটা বড় করে দিই। হুযূর (আ.) কোর্টটি খুলে আমাকে দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি করে বাজারে এসে এক দর্জির দোকানে বসে কোর্টটির শেলাই খুলে কিছুটা বড় করে হুযূর (আ.) কে দিলাম। হুযূর (আ.) এটাকে পড়লেন কিন্তু তখনও এটার বোতামগুলো লাগানো যাচ্ছিল না। তবুও তিনি (আ.) টেনেটুনে এর বোতাম লাগালেন আর এটাও দেখলেন না যে, এ কাপড়টি হুযূরের জন্য মানানসই, নাকি না। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ১২-১৪)

মৌলভী নেক আলম সাহেবের ছেলে হযরত মাস্টার খলীলুর রহমান সাহেব জম্মু কাশ্মীরের ছোম্বরের অধিবাসী ছিলেন, ১৯২৯ ইং সালে পেনশন লাভের পর তিনি কাদিয়ান চলে আসেন। তিনি লিখেন, ১৯০৭ ইং সালের সালানা জলসায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন মসজিদে আকসায় প্রবেশ করলেন মসজিদ তখন লোকে লোকারণ্য, কোন জায়গা খালি ছিল না।

ডাঃ মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব হুযুর (আ.)-এর সাথে ছিলেন। জায়নামায তাঁর বগলে ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আদেশ দিলেন, লোকদের জুতা সরিয়ে এখানেই জায়নামায বিছিয়ে দাও। এর ফলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ডানে নামায পড়লেন ডাঃ ইয়াকুব বেগ সাহেব এবং বাম পাশে পড়লাম এই অধম লেখক। আলহামদুলিল্লাহ।

সে দিন আল্লাহ্‌র বাহাদুর পাহলোয়ান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তৃতা ছিল সবার শেষে। অর্থাৎ সে দিন কমপক্ষে পাঁচ ঘন্টা পর হুযূর (আ.) এর বক্তৃতা হয়েছিল। সেদিন আমি পূর্ববর্তী বক্তাদের কোন বক্তৃতাই শুনি নি। আমার দৃষ্টি ছিল শুধু মাত্র আল্লাহ্‌র বীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রবিত্র ও কল্যাণময় চেহারার দিকে। আমি অঝরে কাঁদছিলাম। এখন মনে হচ্ছে,

হুযুর আনোয়ার (আ.)-কে আমি পরবর্তীতে আর কখনো দেখতে পাবো না, এজন্যই হয়তো এ অধম সেদিন পাঁচ ঘন্টা যাবৎ হুযূর (আ.)এর বরকতময় চেহারা একাগ্রচিত্তে দেখছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম, কারো বক্তৃতার কোন অংশই আমার মনে নেই। এ সময়ে আমি তাঁর ভালবাসার আবেগে খুব করে কেঁদে ছিলাম। আহামদুলিল্লাহ। হুযূর (আ.) তাঁর বক্তৃতার সময় স্টেজে গিয়ে সূরা ফাতিহার সূক্ষ্ম, হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী তফসীর বর্ণনা করলেন।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৪, পৃ; ১২৫-১৩৬)

[মাঝে হুযূর (আই.) বলেন, অনেক আগেই বের হয়েছিলাম কিন্তু তুষারপাতের কারণে আজ রাস্তায় খুব জ্যাম থাকায় দেরী হয়েছে। জুমুআর নামায শুরু হওয়ার পর এখন রোদ উঠেছে। আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করুন। আমি আপনাদের পূর্ণ সময় না নিলেও কিছুটা বেশি সময় অবশ্যই নিব।]

শিয়ালকোট জেলার চাংরিয়া তাহসিলের অধিবাসী হযরত গোলাম রসূল সাহেব (রা.) লিখেন, আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপা ও দয়ায় আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত। এ অধম ১৯০১ইং বা ১৯০২ইং সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করি। তখন আমি এক সপ্তাহ হুযুর (আ.)-এর সেবায় অবস্থান করি। সাধারণত মাগরিবের নামাযের পর তিনি যখন মসজিদে বসতেন তখন আমরা (তাঁর হাত-পা) টিপে দিতাম।

তিনি (আ.) আমাদেরকে নিষেধ করতেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে মৌলভীরা যে সন্দেহের জাল বুনতো তাঁর কল্যাণময় মুখমন্ডল দেখলে তা দূর হয়ে যেত। আমি শুনেছিলাম, প্রতিশ্রুত মাহদীর মুখমন্ডল তারকারাজির মত উজ্জ্বল হবে আর আমি তাঁকে এমনই পেয়েছি। তাঁর মুখমন্ডল দেখেই আমার সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে করম দীন যখন ম্যাজিস্ট্রেট চান্দু লালার আদালতে মামলা করল তখন (এমন কথা) আলোড়িত হচ্ছিল যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অবশ্যই কারাভোগ করবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, মানুষ বলে বেড়াচ্ছে, আমি জেলে যাব কিন্তু আমার আল্লাহ্ বলেছেন, আমি তোমাকে বদরের যুদ্ধের সাহাবাদের মত বিজয় দান করব। হুযুর (আ.) এর এ কথাগুলো এখনো আমার কানে ধ্বনিত হচ্ছে। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ১১১)

সিন্দ প্রদেশের আহমদী হযরত রহমত উল্লাহ্ আহমদী সাহেব লিখেন, আমার নাম রহমত উল্লাহ্। আমার পিতা ছিলেন লুধিয়ানা জেলার বেরমী মৌজার অধিবাসী মৌলভী মুহাম্মদ আমীর শাহ্ কুরাইশী। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহে আমাকে বেছে নিয়েছেন। নয়তো আমার এতোবড় সৌভাগ্য! এর ব্যাখ্যা হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কয়েক মাস লুধিয়ানাতে অবস্থান করেছিলেন, তখন আমার ছাত্র জীবন, বয়স প্রায় ১৭-১৮ বছর। বিভিন্ন সময় আমি হুযূর (আ.)-এর কাছে যেতাম।

হুযূর (আ.)-এর বরকতময় মুখমন্ডলের উজ্জল নূর আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। যার জন্য আমার মন আমাকে বাধ্য করেছে, এটা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। কিন্তু আশেপাশের মৌলভীরা আমাকে সন্দেহে নিপতিত করত। এমন সময় লুধিয়ানায় মৌলভী মুহাম্মদ বাটালভী ও হুযূর (আ.) এর মধ্যে একটি ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা আমার হেদায়াতের জন্য দুই খন্ডের বই 'ইযালায়ে আওহাম'-এর ব্যবস্থা করে দেন।

এটি ছিল হেদায়াত ও নূরে একদম পরিপূর্ণ একটি বই। আল্লাহ্ জানেন, তখন অধিকাংশ সময় আমি সারা রাত ঘুমাতাম না। বই-এর উপর মাথা রেখে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে সেটা আলাদা কথা, অন্যথায় আমি শুধু পড়ছিলাম এবং এ কথা ভেবে কাঁদছিলাম যে, হে খোদা! এটা কেমন বিষয়- মৌলভীরা কুরআন শরীফ পরিত্যাগ করছে কেন? আল্লাহ্ তাআলা জানেন, আমার মনের মাঝে (সত্যের প্রতি) ভালবাসার আগুন উদ্দীপ্ত হচ্ছিল। মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গোভী সাহেবকে আমি চিঠি লিখলাম, হযরত মির্যা সাহেব ৩০টি আয়াত দ্বারা ঈসা (আ.)এর মৃত্যু প্রমাণ করেছেন। ঈসার জীবিত থাকা সম্পর্কে যে সব আয়াত ও হাদীস রয়েছে সেগুলো এবং মির্যা সাহেব কর্তৃক উপস্থাপিত আয়াত ত্রিশটি খন্ডন করে অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমাকে লিখে পাঠান, আমি সেগুলো ছাপিয়ে দিব। উত্তর এলো, ঈসা (আ.) এর জীবন বা মৃত্যু প্রসঙ্গে আপনি মির্যা সাহেব বা তাঁর কোন শিষ্যের সাথে আলোচনা করবেন না।

কেননা অধিকাংশ আয়াতে মৃত্যুর বিষয়টি পাওয়া যায়। (কুরআন করীম দেখলে তো মৃত্যুর আয়াতই পাওয়া যাবে।) সেই অ-আহমদী মৌলভীরা লিখল, এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। বরং মির্যা সাহেব কি করে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হলেন- এ বিষয়ে বির্তক করুন। আমি উত্তরে লিখলাম, হযরত ঈসা মারা গেলে তো মির্যা সাহেব সত্যবাদী সাব্যস্ত হন। এর উত্তর এলো, আপনার ঘাড়ে মির্যা সাহেবের ভূত চেপেছে। আমি দোয়া করবো। এর উত্তরে আমি লিখলাম, আপনি আপনার নিজের জন্য দোয়া করুন। শেষ পর্যন্ত আমি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এমন বিগলিত চিত্তে সমর্পিত হলাম, যেন আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠল।

প্রার্থণা করলাম, হে আমার খোদ! তোমার সন্তুষ্টি প্রয়োজন। আমি তোমার জন্য সব ধরণের সম্মান বিসর্জন দিতে এবং সব ধরণের লাঞ্ছনা বরণ করতে প্রস্তুত আছি। তুমি আমার উপর দয়া কর। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ১৮৯৩ ইং সালের ২৫ ডিসেম্বর রোজ সোমবার আমি আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর সাক্ষাত লাভ করলাম। এ স্বপ্নের বিস্তারিত বিবরণ হল, অধম আসর নামাযের জন্য ওজু করছিলাম।

এমন সময় কেউ আমাকে সংবাদ দিল, রাসূল করীম (সা.) এসেছেন এবং এ দেশেই থাকবেন। আমি বললাম, কোথায়? সে বলল, এ তাবুগুলো হুযূর (সা.) এর। আমি তাড়াতাড়ি নামায পড়ে সেখানে গেলাম। হুযূর (সা.) কিছু সাহাবার মাঝে বসা ছিলেন। সালাম বিনিময়ের পর আমাকে করমর্দনের সুযোগ দিলেন। আমি আদবের সাথে বসে পড়লাম। নবী করীম (সা.) আরবী ভাষায় বক্তৃতা করছিলেন আর আমি আমার যোগ্যতা অনুযায়ী অনুধাবন করছিলাম। এরপর তিনি উর্দূ বলছিলেন, আমি সত্যবাদী, আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত

করো না ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি (রা.) লিখেন, আমি বললাম,

امنا و صدقنا يا رسول الله

সমস্ত গ্রামটি মুসলমান ছিল। আমি ভাবলাম, হে আমার খোদ! এ কি অবস্থা? আজ মুসলমানদের আত্মত্যাগের দিন, এটা যেন হুযুরের প্রাথমিক যুগ ছিল। যদিও আমাকে জানানো হয়েছিল, নবী করীম (সা) এ দেশেই থাকবেন কিন্তু তিনি (সা.) রওয়ানা দেয়ার ঘোষণা দিলেন।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, হুযুর আপনি চলে গেলে আপনার সাথে আমি কিভাবে সাক্ষাত করবো? নবী করীম (সা.) আমার কাঁধে তাঁর বরকতময় হাত রেখে বললেন, ভয়ের কিছু নেই আমি নিজেই তোমার সাথে সাক্ষাত করবো। এ থেকে আমি বুঝলাম, কার্যত আমাকে বুঝানো হল, হযরত মির্যা সাহেবই রসূলে আরবী। আমি বয়আতের চিঠি লিখে পাঠালাম। এরপরই ১৮৯৮ইং সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখ মাগরিবের নামাযের পর কাদিয়ান উপস্থিত হয়ে বয়আত করা সুযোগ হয়।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমাকে এমন দৃঢ়তা দান করেছে যে, কোন সমস্যাই আমাকে পিছ পা করতে পারে নি। আসলে এটা হুযূর (আ.) এর সাথে বার বার সাক্ষাতের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আমার এ হাত হুযুরের শরীর টিপে দেয়ার মর্যাদাও লাভ করেছে। বয়আতের বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মূখী হতে হয় কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমাকে কেবল রক্ষাই করেন নি বরং ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি পুরস্কৃত করেছেন। আমার পিতা, ভাই ও অন্যান্য নিকট আত্মিয়রা আহমদী হয়ে যান। আহামদুলিল্লাহ।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ;৫৮-৫৯)

ঝেলাম জেলার দুলমিয়ালের অধিবাসী হযরত মৌলভী ফাতেহ্ আলী আহমদী সাহেব মুন্সি ফাযেল বলেন, ১৯০৪ইং সালে আমি সপরিবারে এসে হুযূরের হাতে বয়আত করি।

হুযুর (আ.) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন প্রতি বছর তাঁর খেদমতে সপরিবারে উপস্থিত হতাম। যখনই হুযুর (আ.) নামাযের জন্য বাহিরে আসতেন এবং মসজিদে বসতেন তখন দুলমিয়াল জামা'তের আমরা পাঁচ-সাত জন তাঁর পাশে বসতাম।

হুযূরের কথা হতে কল্যাণ মন্ডিত হতাম এবং কয়েক বার দোয়ার আবেদনও করেছি। তখন এ মসজিদটি ছোট ছিল, খুব কষ্টে-সৃষ্টে পাঁচ ছয় জন দাড়ানো যেত। পরবর্তীতে মসজিদে মুবারক প্রশস্ত করা হয়।

একবার আমাদের জামাতের মসজিদের ইমাম মৌলভী কারম দাদ সাহেব বলেন, অনেক দিন পূর্ব থেকে আমাদের মসজিদের ইমাম সৈয়দ জাফর শাহ্ সাহেব আপনার প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি আপনার মান্যকারী কিন্তু বিভিন্ন সময় অ-আহমদীদের জানাযা ও নামাযে ইকতেদা করেন। (মানেন কিন্তু অ-আহমদী মৌলভীর পিছনে নামায পড়েন।) আমি বললাম, এ ব্যক্তি আপনার প্রতি এতটুকু বিশ্বাস রাখে যে, একবার আমাকে দিয়ে এটি চিঠি লিখিয়েছিলেন, আর তিনি এতে লিখান- আমি হুযুরের কুকুরেরও দাস। অজ্ঞতা বশত কখনো যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ক্ষমা করে দিবেন।

এ কথার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সে যখন এখনো জাগতিক ভোগবিলাশের লালসায় বা এগুলো হারানোর ভয়ে অ-আহমদীদের পিছনে নামায বা জানাযা (অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে কাফের বলে তাদের পিছনে নামায) পড়ে তখন সে আমাকে কিভাবে মান্য করল? আপনারা তার পিছনে নামায পড়বেন না। (লেখক একজন দর্জি ছিলেন) তিনি বলেন, তখন আমি হযরত উম্মুল মুমিনীনের আদেশে ভিতর বাড়িতে শেলাই মেশিন আনিয়ে হযরত সাহেবজাদা শরীফ আহমদ (রা.) এর জন্য গরম কোর্ট বানাচ্ছিলাম, তাঁর বয়স তখন ৮/১০ বছর ছিল।

তিনি বলেন, আমরা দুলমিয়াল খেওড়া থেকে আসতাম। আমাদের মহিলারা বলতো পাহাড়ের মধ্যে আমাদের ১০-১১ মাইল পথ পায়ে হেটে আসতে হয় এজন্য আমরা বিছানা আনতে পারি না। এ কথা শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, হামিদ আলী! (হামিদ আলী সাহেব তাঁর খাদেম ছিল) দুলমিয়াল থেকে যারা এসেছে তাদের লেপ ও বিছানা পত্রের ব্যবস্থা করে দিন।

তিনি হুযূর (আ.) এর সহনশীলতা সম্পর্কে একটি ঘটনা বলেন, কারো কোন অসুখ বিসুখ হলে ঔষধ-পত্রও আমরা হুযূর (আ.) এর কাছ থেকেই নিতাম। তিনি বলেন, একবার আমার ছেলে মরহুম আব্দুল আযীয আমার সাথে এলো, তখন তার বয়স ছিল ৮ বছর। সে হুযুরের দুররে সামিনের পংক্তিগুলো সুললিত কণ্ঠে ও উচ্চ স্বরে পাঠ করত। সে জলসায় এবং হুযুরের কাছে এসেও এগুলো পড়ে শোনাত। হুযূর (আ.) তাকে খুব স্নেহ করতেন। এ ছেলেই দুলমিয়ালবাসীর আবেদন ভেতর বাড়ি পৌঁছে দিত।

একবার নেয়ামতের পুত্র মুহাম্মদ আলী বিশেষ একটি দোয়ার আবেদন লিখে হুযূর (আ.) কে দেয়ার জন্য আব্দুল আযীযের কাছে দেয় এবং বাড়ি যাওয়ার অনুমতি আনতে বলে। তখনও ভোর, তাই হুযূর ফযর নামাযের পর লেপ মুরি দিয়ে বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে শুয়েছিলেন। এও বাচ্চা ছিল তাই আদব কায়দার বিষয়টি তেমন বুঝত না যে, হুযূর (আ.) আরাম করছেন। (অনেক সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ফযর নামাযের পর আরাম করতেন) এই বাচ্চা বাড়ির ভিতর গিয়ে হুযূর (আ.) এর মুখের উপর থেকে লেপ সরিয়ে চিরকুট দিয়ে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চায়।

তিনি লিখেন, আমার পিতা-মাতা কুরবান হোন, এতে হুযূর (আ.) এর চেহারায় বিন্দুমাত্র বিরক্তির ছাপও পড়ল না যে, হে বেয়াদব! আমার আরাম নষ্ট করে দিয়েছো। বরং তিনি স্নেহের সুরে বললেন, ঠিক আছে যাও। এই হল তাঁর উন্নত চরিত্রের পরিচয় যার মাধ্যমে তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে তার প্রেমিক বানিয়েছেন। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৩, পৃ; ৭২-৭৩)

আম্বালার শের মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র হযরত বাহওয়াল শাহ্ লিখেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মসীহ্ ও মাহদীর সাথে এ অধমকে কিভাবে সাক্ষাত করিয়েছেন এবং সাক্ষাতের ফলে কী লাভ হয়েছে এ সম্পর্কে আমি সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদাকে হাজির নাযির জেনে বলছি

যাঁর সম্মূখে মিথ্যা বলা কুফর ও পথভ্রষ্টতা এবং জাহান্নামী হওয়ার শামিল। আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় ছোটবেলা থেকেই আমার ধর্মের প্রতি আন্তরিকতা ছিল। প্রায় ৩০ বছর বয়সে নবী করীম (সা.) এর একটি সুন্নতের উপর আমল করতে গিয়ে এবং এতে কিছুটা বক্রতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য ৩ বছর পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা ছিল যাতে দুঃখ-কষ্টের কোন সীমা ছিল না। আমর চেয়ে গ্রামবাসীর কষ্ট ছিল বেশি। কেননা তারাই ছিল বক্রতার কারণ। বাল্যকাল থেকেই আমার মনে কোন সত্য পথ প্রদর্শকের আকাঙ্খা ছিল।

অনেক বুযুর্গের প্রতি আমার দৃষ্টি ছিল কিন্তু হৃদয়ে প্রশান্তি ছিল না। শেষ পর্যন্ত চক লোহাটীর মিয়াঁজী ইমাম উদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবীর বিষয়ে জানতে পারি। ইনি আমার শিক্ষক ছিলেন এবং মৌলভী আব্দুল হক সাহেব যিনি তখনও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে মান্য করেন নি, আমার পর তিনি আহমদী হয়ে মারা গেছেন, তার পিতা ছিলেন। তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। আল্লাহ্ তার উপর দয়া করুন। তিনি বলতেন, এ যুগ এক যুগ-ইমামের প্রত্যাশী এবং প্রকৃত পক্ষে মির্যা সাহেব সত্য ইমাম। মানুষ তাকে মন্দ বলে।

তিনি আমাকে ও মৌলভী আব্দুল হক সাহেবকে সম্বোধন করে বলতেন, দেখো! তোমরা কখনো তাঁকে মন্দ বলবে না। মৌলভ মুহাম্মদ হোসেন যখন দিল্লীতে মৌলভী নাযির হোসেনের কাছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উপর কুফরী ফতোয়া দেয়ার জন্য এসেছিল তখন আমি ও মৌলভী আব্দুল হক সাহেব মৌলভী নাযীর হোসেনের কাছে পড়াশোনার জন্য দিল্লীতেই ছিলাম। ছয়-সাত মাস পর আমি চক লোওহাটে আমার শিক্ষকের কাছে ফিরে আসি কিন্তু মৌলভী আব্দুল হক সাহেব দিল্লীতেই পড়তে থাকেন।

মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন দিল্লী থেকে ফিরে আমাদের গ্রামের আশেপাশে মানুষদের দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে কাফের বলানোর জন্য ঘুরে ঘুরে প্রচার করতে শুরু করে। মিয়াঁজী ইমাম উদ্দীন সাহেবের কাছেও এসেছে কিন্তু কখনো তিনি বাজে মন্তব্য করেন নি। তিনি বললেন, আপনি কুফরের যে প্রাসাদ নির্মান করেছেন সেখানে আমার ইট লাগানোর সুযোগ কোথায়? আপনি আলেম, আপনার মুবারক হোক। পরিশেষে মুহাম্মদ হোসেন নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

মামলা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করায় হযরত মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানোয়ারী সাহেব ও মৌলভী আব্দুল হক সাহেব আমাকে দোয়া করানোর জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কাছে পাঠালেন। বাটালা থেকে রওয়ানা দিয়ে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা শুরু করলাম; যার সাথেই সাক্ষাত হচ্ছিল সে বলছিল, সেখানে যেও না। তিনি এমন, তিনি ওমন ইত্যাদি ইত্যাদি। মৌলভীরা তাকে মন্দ বলে, তুমিও মন্দ অর্থাৎ কাফের হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি তাদের বললাম, এখন তো এসে গেছি আল্লাহ্ যা করে; তিনি সত্য হলে আল্লাহ্‌র ফযলে মৌলভীদের আমি ভয় পাই না। ১৮৯৮ইং সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে আমি দারুল আমান-এ পৌঁছালাম। সেদিন দিনের আলো ফুরোতে অল্প সময় বাকী ছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মসজিদে মুবারকের উপর ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), মৌলভী আব্দুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব (রা.), মুফতী সাদেক সাহেব (রা.) এবং আরো কয়েক জন সাহাবী হুযুরের সাথে ছিলেন। মরহুম মৌলভী আব্দুল কাদের লুধিয়ানী মসজিদে মুবারকের উপরে সিড়ির কাছে দাড়িয়ে ছিলেন। ইনি মৌলভী আব্দুল হক সাহেবের আরবী গ্রামার শিক্ষক ছিলেন এবং আমাকেও চিনতেন। তিনি খুব আনন্দ ও আগ্রহের সাথে আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। আমাকে দেখে তিনি খুব আনন্দিত হলেন।

তিনি বললেন, তুমি বয়আত করতে এসেছো? আমি বললাম, দোয়া করানোর জন্য এসেছি। আবার বললেন, মৌলভীদের ভয় পাও? আমি বললাম, না, আমি তো মৌলভীদের ভয় পাই না। হুযুরের পবিত্র মুখশ্রী দেখার পরই আমার কাছে হযরত মসী?হ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। কেননা এমন চেহারার লোক মিথ্যাবাদী হতে পারে না। সূর্যাস্তের সময় হয়ে এলো। হুযুর (আ.) এর কাছে আরেক ব্যক্তি বয়আত নেয়ার জন্য বেশ কয়েক দিন যাবৎ এসেছিল। তিনি বললেন, হুযুর আপনি আমার বয়আত নিন, আমি বাড়ি ফিরে যাব। হুযূর (আ.) বললেন, থাক, খুব ভাল ভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। এরপর তিনি অন্য বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। মৌলভী আব্দুল কাদের সাহেব নিজে হুযুরের কাছে আমার বিষয়ে বললেন, এ ব্যক্তি বয়আত করতে চায়।

হুযূর (আ.) একটু উচু স্থানে বসে ছিলেন, এ কথা শোনা মাত্র নিচে বসলেন এবং বললেন, যারা বয়আত করতে চাও চলে আস। যিনি প্রথম বয়আত করতে চেয়েছিলেন সে ব্যক্তি তো আগে থেকেই হুযুরের কাছে বসা ছিল। আমি সিড়ি থেকে এগিয়ে হুযুর (আ.) এর দিকে এগুলাম যখন দু-তিন হাত দুরত্বে পৌছলাম তখন আমার হৃদয়ের মধ্যে এমন আকর্ষন সৃষ্টি হল যেন কেউ আমাকে রশি দিয়ে তার দিকে টেনে নিচ্ছে। আমার হৃদয় বিগলিত হল এবং আমি গিয়ে হুযূরের পাশে বসলাম। আনন্দের সাথে আমরা দু'জন বয়আত করলাম এবং পরে হুযুরের কাছে মামলার বিষয়ে দোয়ার জন্য আবেদন করি। হুযুর (আ.) দোয়া করলেন।

এরপর আমি সেখানে দশ দিন থাকলাম। তিনি বলেন, হুযূর ও কাদিয়ানের সাথে এমন ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেল যে, বাড়ি ফিরে যেতে মন চাচ্ছিল না। কাদিয়ানকে একদম বেহেস্তের মত মনে হচ্ছিল। এখানে সারা দিন আল্লাহ্ তাআলার যিকর ছাড়া জাগতিক চিন্তা-ভাবনার আওয়াজও শোনা যেত না। সব দিক থেকে সালামের আওয়াজ ধ্বনিত হতো।

আমার সব দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে গেল। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা হত্যা মামলা চলছিল বা করা হয়েছিল। অতঃপর আমি অনুমতি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। তিনি বলেন, কিন্তু বয়আত করার পর আমার অবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেল। আল্লাহ্‌র সাথে এতো গভীর প্রেম ও ভালবাসা সৃষ্টি হল যে, রাত-দিন তাঁর যিক্‌র ছাড়া ঘুমাতেও মন চায় না। ঘুমালেও ভয়ে ভীত হয়ে উঠে পরতাম, যেন কোন প্রেমিক তাঁর প্রেমাস্পদ হতে

পৃথক হচ্ছে। আমার হৃদয়ে এক অদ্ভুত অবস্থা বিরজ করছিল। বার বার এমন মনে হতো, কেউ যেন আমার হৃদপিন্ড হাতে ধরে ধুয়ে দিচ্ছে। দিন দিন নামাযের মাঝে হৃদয় বিগলিত হচ্ছিল। এটা ছিল হুযূর (আ.) এর দৃষ্টির প্রভাব।

একদিন আমার মনের অবস্থা এমন হল, যেন আমার হৃদপিন্ড বিদীর্ণ হয়েছে এবং একে দোয়া করে ধৌত করা হয়েছে। আর এতে একটি নতুন আত্মা প্রবিষ্ট হয়েছে। যাকে রূহুল কুদুস বলা হয়। আমার অবস্থা গর্ভবতী নারীর মতো হল। আমার পেটের মাঝে বাচ্চার মত মনে হতো। আমার অস্তিত্ব পরিপূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হল এবং আলোকিত হল এবং মনে হতো বুকের মাঝে নূর দৌড়াচ্ছে। যিক্‌র করার সময় জিহ্বায় এমন সুখকর অনুভূতি সৃষ্টি হতো যা অন্য কিছুর মাঝে নেই।

আমার পিছনে যারা নামায পড়ত তারাও নামাযে খুব তৃপ্তি পাচ্ছিল। তারা আনন্দিত হয়ে বলতো কেমন সুন্দর নামায পড়িয়েছ। এটা আসলে আমার অবস্থা ছিল না বরং এটি ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অবস্থার প্রতিচ্ছবি।

আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ায় আমি দারুল আমানে থাকা অবস্থাতেই মামলা খারিজ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা একে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কাছে পৌছার মাধ্যম বানিয়ে ছিলেন যার মাধ্যমে তাঁর অধম বান্দাকে আকাশে পরিভ্রমণ করিয়েছেন এবং তাঁর সাক্ষাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।

মসজিদের মধ্যে আমি একা একা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও বিরোধীদের বই নিয়ে বসতাম ও গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করতাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর যুক্তি প্রমাণগুলো কুরআন শরীফের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেতাম।

একদিন আমি এক বিরোধীর বই দেখছিলাম এবং এ কথা ভেবে মনে মনে আশ্চর্য হচ্ছিলাম, এরা কেমন আলেম যারা এমন বই রচনা করে। এমনটি ভাবতেই ঘুম এলো, আমি ঘুমিয়ে পরলাম এবং ইলহাম হল, بل عجبوا ان جاء هم قوم منذر অর্থাৎ বরং তারা এই ভেবে আশ্চর্য হয় যে, তাদের কাছে এক সর্তককারী জাতি এসেছে।

এ ইলহামটি আমার মনের মাঝে এমন ভারে উন্মেষ ঘটালো যে, গলনালী দিয়ে কোন জিনিস যেন প্রবেশ করেছে। মনে হওয়ার সাথে সাথেই আমি বলতে শুরু করলাম। এ ইলহামের এই অর্থ করা হয়েছে যে, এ আলেমরা এমন জাতি যখন এদের কাছে সর্তককারী অর্থাৎ নবী এসেছেন তখন তারা (এ সব মৌলভীরা) আশ্চর্য হয়। আমি আমার ইলহাম ও স্বপ্নসমূহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কাছে লিখতাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর যখন কেউ কোন আপত্তি করত এর উত্তর দেয়ার জন্য তখনই আমার মনে কুরআন শরীফের আয়াত ভেসে উঠতো।

আমি কুরআন শরীফ থেকে এর উত্তর দিতাম। একবার এক মৌলভী আমার কাছে এসে বলল, কুরআন শরীফ থেকে হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু প্রমাণ করুন। এমন আয়াত দেখান যেখানে মৃত্যু শব্দ এসেছে। আমি বললাম দেখো আল্লাহ্ তাআলা বলছেন,

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

অর্থাৎ আহলে কিতাবের যে কেউ এখন কুরআন করীমের এ সিদ্ধান্ত পড়ার পর যে, হযরত ঈসা (আ.) শুলবিদ্ধ হয়ে বা হত্যার মাধ্যমে মারা যান নি বরং স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন- এর উপর ঈমান আনবে না। (সূরা আন্ নিসা, ১৬০)

অর্থাৎ তারা এমন কথার উপর ঈমান আনবে যে, তিনি শুলবিদ্ধ বা হত্যার মাধ্যমে মৃত্যু বরণ করেন নি।

- এরই প্রতি ইঙ্গিত করছে এবং এর অর্থ ঈসা (আ.)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু।

হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের দিন এ সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি শূলবিদ্ধ বা হত্যার মাধ্যমে মৃত্যু বরণ করি নি বরং আমি কুরআন শরীফের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছি। এ কথা শোনা মাত্রই সেই মৌলভী চলে যায়। এ জন্য সেই গ্রামের অধিকাংশ লোক আহমদী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মৌলভীদের প্ররোচনা ও ভীতি প্রদর্শনের দরূন কিছু লোক মুর্তাদ হয়ে যায়। (রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৪, পৃ; ১০৭-১১২)

হযরত মদদ খান সাহেব (রা.) কাদিয়ানের বায়তুল মাল ইন্সপেক্টার ছিলেন। তিনি কাশমীরের অধিবাসী এবং ১৮৯৬ইং সালে বয়আত করে ১৯০৪ইং সালে হুযুরের সাথে সাক্ষাত করেন।

তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় খোদা! আমি তোমার পবিত্র নবী সম্পর্কে লিখতে যাচ্ছি কাজেই তুমি এতে বরকত দান কর। এতে যেন মনগড়া কোন কথা লিখা না হয়।

তিনি লিখেন, ১৯০৪ইং সালে গুরুদাস পুর চান্দু লালের আদালতে করম দীনের মামলা ছিল। খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব ছিলেন হুযূর (আ.) এর পক্ষের উকিল এবং করম দীনের উকিল ছিল, মোল রাজ ও নবী বাখ্‌শ।

এ অধম, সৈয়্যদ আহমদ নূর সাহেব এবং হাফেজ হামিদ আলী সাহেব একবার কাদিয়ান থেকে গাড়িতে করে বই নিয়ে গুরুদাস পুর পৌছলাম। সেখানে ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব গুড়ীয়ানি ওয়ালেকে খুব অস্থির দেখলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ডাক্তার সাহেব আপনাকে এমন ভীত শন্ত্রস্থ দেখাচ্ছে কেন? তিনি বললেন, ভাই সাহেব! আমার ভীতির কারণ, আমি শুনেছি এখানে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, হুযূর (আ.) কে তারা পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও কারাবন্দি করবে। চান্দু লাল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে।

একজন বড় অফিসার এ খবর দিয়েছেন। আমি ডাক্তার সাহেবকে বললাম, এখন আপনি কি করতে চান? বা কি করা উচিত? ডাক্তার সাহেব বললেন, একটা ভাল কাজ

করুন। হুযূর (আ.) কে এ বার্তা পৌছে দিন যে, তিনি যেন গুরুদাসপুর না আসেন এবং একটি অসুস্থতার সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেন যদি একশত টাকাও খরচ হয় সমস্যা নেই, আমি নিজে এর ব্যয়ভার বহন করব। ডাক্তার সাহেবকে বললাম, হুযুর কি মিথ্যা সার্টিফিকেট নিবেন?

ডাক্তার সাহেব বললেন ভাই সাহেব! কেউ যদি নেকী করতে চায় তো করুক। আমি বললাম, তবে কি এখনই কেউ রওয়ানা দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমাকে একটি হারিকেনের ব্যবস্থা করে দিন, আমি রাতেই চলে যাব। ডাক্তার সাহেব তখনই একটি হারিকেন দিলেন।

আমি গুরুদাসপুর থেকে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে শেখ হামিদ আলী সাহেব এবং মুন্সি আব্দুল গনী সাহেবের সাথে সাক্ষাত হল। রাত ২টার সময় আমরা মসজিদে মুবারক পৌছলাম। আমাদের খবর পেয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বাইরে এলেন। আমি আসসালামুআলাইকুম-এর পর বললাম, ডাক্তার ইসমাঈল সাহেবের অবস্থা খুব খারাপ। তিনি আমাকে এ সংবাদ দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন। এ কথা শুনে হুযুর (আ.) বললেন, আমার তো আগে থেকেই মাথা ঘুরার সমস্যা আছে আর সার্টিফিকেট নেয়ার কথাও ভেবে ছিলাম। কিন্তু এখন তো আমি গুরুদাস পুর গিয়ে-ই সার্টিফিকেট নিব। আর এটা কোন ভয়ের কথা নয়। তিনি (আ.) আমার জন্য বাড়ির ভিতর থেকে লেপ পাঠালেন, আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম তাই ঘুমিয়ে পরলাম। আর ওনিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) গুরুদাসপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

তিনি (রা.) বলেন, লোকেরা আমাকে যেতে মানা করল এবং বলল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রওয়ানা হয়ে গেছেন, আর হয়তো পৌঁছেও গেছেন। কিন্তু আমি ঘুম থেকে জেগে তৈরী হয়ে হেটেই রওয়ানা দিলাম। যদিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলে ছিলেন, ও যেন পায়ে হেটে না আসে, তাকে টাঙ্গা গাড়িতে পাঠিও। পথে আমার অবস্থা খুব সঙ্গিন হল এবং গায়ে জ্বর এলো। হুযুর (আ.) যে বাসায় উঠে ছিলেন সন্ধ্যায় আমি সেখানে পৌঁছলাম। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই শুনলাম, হুযূর বলছেন, মদদ খানকে কি এক্কায় উঠিয়ে এনেছ, নাকি না? এ কথা শোনার পর মনে হল, ঘুমন্ত মানুষের জাগ্রত হওয়ার ন্যায় আমিও জেগে উঠলাম। আঙ্গিনায় পৌঁছার পর কোন এক বন্ধু বললেন, হুযুর মদদ খান এসেছে।

আমি গিয়ে হুযূরকে আসসালামুআলাইকুম বললাম। হুযুর আমার দিকে তাঁর পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমার হাত ধরে বললেন, যাযাকাল্লাহ, এ ব্যক্তি খুব সাহসী, সে তিনবার যাতায়াত করেছে। হুযুর আমার হাত ততক্ষণ ধরে রাখলেন যতক্ষণ না আমি এমন অনুভব করলাম যেন গুরুদাসপুর থেকে কাদিয়ান যাই-ই নি।

ঘুম ও ক্লান্তির কারণে আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম, কারো সাথে কথা বলতেও মন চাচ্ছিল না এবং শরীরে জ্বর ছিল। কিন্তু আমার সমস্ত ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হয়েছে এমন অনুভূত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাসূল এ অধমের হাত ছাড়েন নি। কয়েক মিনিট পূর্বেও আমি নিস্প্রভ ছিলাম আর হুযুরের পবিত্র হাতের সাথে আমার হাত লাগতেই আমার ব্যথা ও ক্লান্তি দূর হয়ে গেল, শরীর ফুরফুরে হয়ে গেল এবং আর কষ্টের কিছুই বাকী থাকল না।

এটা তো হুযুরের কোন কেরামত। তখন আমার মনে হল, ক্ষুধা ও পিপাসা সুসংবাদ পেলে দূর হতে পারে এটা মেনে নিলাম কিন্তু যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও ঘুম হুযূরের পবিত্র হাতের সংস্পর্শেই দূর হয়েছে। এটা হুযূরের কেরামত না হলে আর কী? ইতিপূর্বে আমার শরীর পাথরের মত ভার হয়ে গিয়েছিল। নড়াচড়া করতে কষ্ট হচ্ছিল। আমার মনে হল, একেই বলে মৃতকে জীবিত করা। মনে হচ্ছিল আমি কখনো গুরুদাসপুর যাই-ই নি। হুযুর (আ.) খাবার আনার আদেশ দিলেন। এ অধমকেও তাঁর সাথে বসালেন। আমি হুযুরের সাথে খাবার খেলাম। আমার প্রতি এটা হুযুরের বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া ছিল।

(রেজিস্টার রেওয়ায়াতে সাহাবা নং ৪, পৃ; ৮২-৮৭)

এই ছিল সেই সব বুযুর্গদের ঘটনা যা আমি ইতিপূর্বেও দু'একবার শুনিয়েছি। বিভিন্ন সময় এগুলো বর্ণনা করার কারণ, বিশেষ করে যেন সে সব পরিবারের কথা মনে থাকে যেগুলোতে এমন বুযুর্গ রয়েছেন, আমাদের প্রতি যাঁদের অনেক অনুগ্রহ। অন্যথায় হয়ত-বা সত্যকে মানার এরূপ সাহস অনেকের মাঝেই হতো না, যেরূপ সাহসিকতা এ সব বুযুর্গ প্রদর্শন করেছেন। কাজেই এ সব বুযুর্গের বংশধরদের উচিত তারা যেন তাদের বুযুর্গদের জন্য অনেক দোয়া করে। আর নিজেদের ঈমানের উন্নতি ও দৃঢ়তার জন্যেও দোয়া করা উচিত। এছাড়াও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে তাঁদের যে সম্পর্ক ছিল সেটাকে দৃষ্টিপটে রেখে সেই আদর্শ অনুসরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এদের কেউ কেউ এমন লোকও ছিলেন যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কম ছিল কিন্তু তাদের মাঝে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার তৃষ্ণা মিটানোর এক ধরণের ব্যকুলতা ছিল।

তারা সেই তৃষ্ণা মিটিয়েছেন এবং প্রকৃত প্রেমিক সাব্যস্ত হয়েছেন। ফলে তাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন যা আমি কিছুক্ষণ পূর্বেই শুনালাম। অতএব এই হল সেই বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার উপমা যা পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও আন্তরিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

অনুবাদ ঃ

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

হযরত উমর (রা.)

মূল: মাশহুদ আহমদ এবং ফজল আহমদ
ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ

ভূমিকা

ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে এক যুবক হঠাৎ করে পরিবর্তিত হয়েছিল। সে ছিল এই নতুন ধর্মটির কট্টর দুশমন। কিন্তু তার চরিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে আর ইসলামের প্রতিরক্ষায় সে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখে বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতার পরিচয় দেয়। তার আগ্রাসী ও সহিংস মনোভাব নাটকীয়ভাবে বিনয় ও নম্রতায় রূপান্তরিত হয়। আর, পরবর্তীকালে তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হয়েছিলেন।

যাহোক, সব মুসলমান কিন্তু উমরকে (রা.) শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। সংখ্যালঘু শিয়া সম্প্রদায় তাকে গালি দেয় এবং মনে করে যে, তিনি হযরত আলীকে খলীফা হতে দেন নি। [হযরত আলী পরবর্তীতে চতুর্থ খলীফা হয়েছিলেন]। বলা হয় যে, এজন্য নাকি তিনি আবু বকরের (রা.) সঙ্গে একটি চুক্তি/আঁতাত করেছিলেন। এই প্রবন্ধে হযরত উমরের (রা.) প্রাথমিক জীবন, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং অর্জন খুব সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

পটভূমি

উমর ইবন-আল খাত্তাব (রা.)-এর যেন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হওয়ারই কথা ছিল। ৫৮০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মক্কায় কুরাইশ গোত্রের বনু আদি উপগোত্রে/কবিলায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। এই বনু আদি কবিলাটি/শাখাটি/উপগোত্রটি অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে কুরাইশদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করতো। ভাই যায়েদ এবং বোন ফাতেমার সঙ্গে তিনি বড় হন। তার বাবা খাত্তাব ইবনে নুফায়েল মধ্যবিত্ত পরিবারের হলেও তার হাতে মোটামুটি রকমের অর্থবিত্ত ও ক্ষমতা ছিল। তাই, তরুন উমর (রা.) ভালো শিক্ষালাভ করেছিলেন। তৎকালীণ আরবদের মধ্যে অধিকাংশই যেখানে নিরক্ষর ছিল, তার বিপরীতে উমর (রা.) ছিলেন শিক্ষিত, এমনকি আরবী কাব্যচর্চায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। জীবনীকারকদের বর্ণনায় তাকে লম্বা, স্বাস্থ্যবান, ফর্সা এবং আরক্তিম চেহারার অধিকারী বলা হয়েছে।

যুবক হিসেবে তিনি আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি জনসমক্ষে বক্তৃতা করার শিক্ষাও গ্রহণ করছিলেন (তিনি খুব ভালো কুস্তিগির ছিলেন)। এছাড়া, লেনদেনের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই তার মধ্যে অসামান্য সাহস ও অকপটতার প্রকাশ দেখা যেত। যে কাজেই তিনি হাত দিতেন, তা অত্যন্ত সূচারুরূপে সম্পন্ন করতেন।

বাল্যকালে তিনি মেষপালক ও বণিক হিসেবেও কাজ করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এভাবে তিনি একজন বিচক্ষণ ও চৌকশ ব্যবসায়ীতে পরিণত হন। সিরিয়া, ইরাক ও দূর-দূরান্তের বাণিজ্য কাফেলায় তিনি নেতৃত্ব দিতেন। এর ফলে অন্যান্য গোত্র এবং তাদের আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

অমুসলিম কুরাইশদেও প্রচলিত ধর্মমতের (মূর্তিপূজার) প্রতি বিশ্বাসী হিসেবে তার চোখে ইসলাম ছিল মক্কার ঐতিহ্যের প্রতি একটি প্রকাশ্য অপমান। ইসলামের প্রবল ও কট্টর বিরোধীতে পরিণত হন তিনি। মক্কায় মুসলমানদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন তিনি। মুসলমানদেও নিপীড়নের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ছিলেন তিনি। ইবনে হিশামের "আস সিরাহ-আন-নাবিঈয়া" অনুসারে, উমরের (রা.) দাসীদের মধ্য থেকে একজন যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন তিনি তাকে প্রচ-প্রহার করলেন, যদিও সেই দাসী ইসলাম পরিত্যাগ করে নি।

তার মা হানতামা ছিল আবু জাহলের বোন। তাই, উমর (রা.) মক্কার নেতৃত্বের খুব কাছাকাছি ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যারা প্রবলভাবে ইসলামের বিরোধীতা করছিল। তার ইসলাম গ্রহণের আগের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো, একবার তিনি একদল মুসলমানকে দেখলেন গাট্টি-বোচকা উটে চড়িয়ে আবিসিনিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা করতে। তাদের মধ্যকার একজন মহিলার কাছে গিয়ে উমর ডাকলেন, "উম্মে আব্দুল্লাহ" এবং বললেন, "তোমরা কি চলে যাচ্ছ?" সে জবাব দিল, "হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী। কারণ, তোমরা এখানে আমাদের সঙ্গে খুবই নির্মম ব্যবহার করছো। যতদিন না আল্লাহ আমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করছেন, আমরা আর ফিরবো না।"

উমর খুবই আশ্চর্য হলেন এবং কিছুটা আবেগপ্রবণও হলেন এতে। তখন মহিলাটিকে তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমার সহায় হন।" উমরের বাহ্যিক কঠোরতার ভেতরে এক সংবেদনশীল মনমানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিব্রতবোধ করলেন এজন্য যে, এই নতুন ধর্মমতটি [অর্থাৎ ইসলাম] দৃশ্যত তাদের গোত্রকে বিভক্ত করে ফেলছে। তখন তিনি ভাবলেন, তিনি যদি এই নতুন নবীকে হত্যা করেন তাহলে তার কুরাইশ গোত্রের এই লোকেরা [অর্থাৎ আবিসিনিয়াগামী মুসলমানদের এই কাফেলাটি] মক্কায় ফিরে আসবে। আর এভাবেই তার গোত্র পুনরায় একত্রিত হবে।

ইসলাম গ্রহণ

ইবনে হিশামের বিস্তারিত বর্ণনায় দেখা যায়, একদিন সকালে উমর (রা.) তরবারি হাতে বের হলেন। উদ্দেশ্য, মহানবী (সা.)-কে হত্যা করবেন তিনি। তখন তাকে জানানো হলো যে, তার আপন বোন ফাতেমা ও বোন-জামাই সাইদ ইবনে যায়েদ (তিনি উমরের চাচাতো ভাইও ছিলেন) ইসলাম গ্রহণ করেছে। এতে উমর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তখন তিনি বোনের বাড়িতেই প্রথমে গেলেন তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য।

বোনের ঘরে প্রবেশের সময় তিনি খাব্বাব ইবনে-আল আরাত এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। উমরের (রা.) বোন ফাতেমাকে কুরআন শেখাচ্ছিলেন খাব্বাব। তখন ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন উমর (রা.)। তাকে দেখেই লুকিয়ে পড়লো খাব্বাব, আর তার

বোন ফাতেমা কুরআনের আয়াত সম্বলিত পাতাগুলো সরিয়ে ফেললো। বোনের মুখোমুখি হয়েই উমর (রা.) বললেন, "শুনেছি তুমি নাকি তোমার নিজের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছো।" এরপর তিনি বোন-জামাই সাইদকে আঘাত করার জন্য হাত তুললেন। কিন্তু ফাতেমা দু'জনের মাঝে চলে আসায় আঘাতটি তার নাকে লাগলো ও সে আহত হলো। এতে সে মোটেও দমে গেল না, বরং ভাইয়ের দিকে ফিরে বললো,

"হ্যাঁ, আমরা এখন মুসলমান। আর পরেও তা-ই থাকবো। তোমার যা ইচ্ছা করো।"
বোনের চেহারায় রক্ত দেখে উমর (রা.) লজ্জিত হলেন। তিনি এটাও অনুভব করলেন যে, নতুন ধর্মটির [ইসলামের] মধ্যে এমন কিছু আছে যা তার বোনের হৃদয় জয় করেছে। অনুতপ্ত হয়ে তিনি বললেন, তোমরা কী শুনছিলে? আমাকে শোনাও। প্রথমে তার বোন ভয় পেয়ে গেল, উমর হয়তো কুরআনের পাতাগুলো ছিড়েই ফেলবে! কিন্তু উমর (রা.) ওয়াদা করলেন এ রকম কিছু তিনি করবেন না। তখন ফাতেমা তাকে হাত-মুখ ধুয়ে আসতে বললো যেন তার মেজাজ ঠান্ডা হয় আর যেন কুরআন স্পর্শের আগে তিনি পবিত্রতা অর্জন করেন।

অতঃপর উমর (রা.) সূরা তা'হার কিছু আয়াত পাঠ করলেন: "নিশ্চয় আমি-ই আল্লাহ। আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম কর। প্রতিশ্রুত মুহূর্ত নিশ্চয় আসবে। আমি শীঘ্রই তা প্রকাশ করবো যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চেষ্টানুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়।" [২০:১৫-১৬]

তার হৃদয়ে বাস্তবিক পরিবর্তন ঘটলো। তিনি উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠলেন, কি সুন্দর, কি মনোহর।
উমরের (রা.) মাঝে এই প্রতিক্রিয়া দেখে খাব্বাবও আড়াল থেকে বেড়িয়ে এলেন এবং বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন,
"আল্লাহ সাক্ষী, গতকালই আমি শুনেছি মহানবী (সা.) উমর অথবা আমর ইবনে হিশাম [আবু জাহল]-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া করছিলেন। তোমার পরিবর্তন তো সেই দোয়ারই ফল।"
[The life of Muhammad, p. 20]

এরপর উমর (রা.) মক্কায় দার-আরকাম-এ [আরকাম এর ঘরে, সে ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং মহানবী (সা.) তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন] গেলেন মহানবী (সা.)-এর কাছে। তখনো তার হাতে তলোয়ার ছিল, তবে তা আর ইসলামের বিপক্ষে হুমকিস্বরূপ ছিল না। দরজায় হামজা, তালহা এবং আরো দু'জন সাহাবী দ-ায়মান ছিলেন। ইতিপূর্বে উমরের (রা.) হাতে নির্যাতিত হওয়ায় সাহাবীরা (রা.) তাকে ঘরে ঢুকতে দিতে চাচ্ছিল না, ইতস্তত করছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) উমরের (রা.) মনোভাব জানতেন। তিনি (সা.) বললেন,
"উমর, কি জন্য এসেছো?"
উমর (রা.) জবাব দিলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এখানে মুসলমান হওয়ার জন্য এসেছি।"
এরপর উমর (রা.) কলেমা পাঠ করলেন। মহানবী (সা.) সন্তোষভরে প্রত্যুত্তরে বললেন, "আল্লাহ আকবার"।
এই সুখবরটি অচিরেই মক্কা ও আশেপাশের শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়লো।
আদ দাহাবির মতে তখন উমর (রা.)-এর বয়স ছিল মাত্র সাতাশ বছর। ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগে মুষ্ঠিমেয় কিছু লোক মুসলমান ছিল। গবেষকরা সেই সময়ের মুসলমানদের সংখ্যা নিয়ে একমত নন। তবে এটা মনে করা হয় যে, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তখন প্রায় চল্লিশ জন পুরুষ এবং দশ জন নারী মুসলমান ছিল।
ইসলাম গ্রহণের পর ভয়াবহ জুলুম-নির্যাতনের মোকাবেলায় এর অন্যতম সাহসী এবং একনিষ্ঠ সেবক ও রক্ষকে পরিণত হন তিনি। তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে পরবর্তীতে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,
"যখন আমি কুরআন শ্রবণ করলাম, আমার হৃদয় নরম হলো এবং আমি অশ্রুপাত করলাম আর ইসলাম আমাতে প্রবেশ করলো।"
[Armstrong p. 5]

তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করলো। তার বয়াত গ্রহণের পরপরই মক্কায় মুসলমানরা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন। এর সত্যায়ন করেছেন ইবনে আব্বাস (রা.) ও সুহায়েব।
ইবনে মাসুদ নিম্নোক্ত কথা বলেছেন বলে বলা হয়ে থাকে:
"উমরের ইসলাম ছিল একটি সূচনা, তার হিজরত ছিল একটি সাহায্য এবং তার ইমামত ছিল একটি অনুগ্রহ। আমি দেখেছি, উমরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমরা সেই গৃহে [কা'বা গৃহে] প্রার্থনা করতে পারতাম না।"
ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম যে কাজটি উমর (রা.) করেছিলেন, সেটি হলো মক্কার নেতাদের একতে ডেকে ঘোষণা করা যে, তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন। তাদের কারো মধ্যেই এই সাহস ছিল না যে তাকে ইসলাম পরিত্যাগ করতে বলবে। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-কে অনুরোধ করেন কা'বা গৃহে গিয়ে নামাজ পড়ানোর জন্য। মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে সেখানে নিয়েও যান উমর (রা.)। কা'বা গৃহে এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম নামাজ আদায়।

উমরের (রা.) ধর্মান্তরের ঘটনা মুসলমানদের সাহসী করে তুললেও মক্কাবাসীদের মনোভাবে কোনো পরিবর্তন আনেনি। অন্য মুসলমানদের মতো উমর (রা.)ও তাদের হাতে নিগৃহিত হয়েছেন। সময়ের সাথে সাথে এই জুলুম-নির্যাতন বেড়েই চলছিল।
মহানবী (সা.)-এর অধীনে ভূমিকা
মহানবী (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতায় পরিণত হলেন উমর (রা.)। তিনি তার অর্থবিত্ত ইসলামের খেদমতে দান করলেন, স্বীয় জীবন উৎসর্গ করলেন।

হিজরতের সময় প্রথম দলের সঙ্গে তিনি মক্কা থেকে মদীনায় গিয়েছেন। মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি স্থানীয় মূর্তিপূজকদেরকে তার মদীনা যাওয়ার কথা জানিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন, তারা যদি সাহসী হয় তাহলে যেন তাকে বাঁধা দেয়। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তারা কেউ সাহস করে নি।
মদীনায় প্রথমাবস্থায় স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য মুসলমানদের অনেক প্রতিরক্ষামূলক সংগ্রাম করতে হয়েছে। এসবের বেশিরভাগগুলোতেই উমর (রা.) অংশ নিয়েছেন। বদর, উহুদ এবং খাইবারের প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধগুলোতে, যেগুলোতে মুসলমানরা জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে, সেসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তিনি। উহুদের যুদ্ধে মক্কার লোকেরা মনে করেছিল তারা মহানবী (সা.)-কে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মুসলমানদেরকে

হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে। মক্কাবাসীর নেতা আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলছিল, "উলো হোবল" [মক্কাবাসী পৌত্তলিকদের মূর্তি হোবলের মহিমা বুলন্দ হোক] এবং যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরে চিৎকার করে মহানবী (সা.)-এর নাম নিয়েছিল, তারপর আবু বকর (রা.) এবং অবশেষে উমরের (রা.), তারা জীবিত আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য।
[তাবারি, ভলিউম: ৭, পৃষ্ঠা: ১৩১]
এতে দেখা যায়, এখানে উচ্চারিত তিন জনের নামের মধ্যে উমর (রা.)-এর নামও রয়েছে। এতে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে তার অবস্থান বুঝা যায়।

মুসলমান হওয়ার পর প্রথমদিকে তার মেজাজ কিংবদন্তি/প্রসিদ্ধ ছিল, যদিও তার উগ্রতা কেবল মহানবী (সা.)-এর প্রতিরক্ষার খাতিরেই ব্যবহৃত হচ্ছিল। এ রকম একটি ঘটনা হলো, একটি অন্তেষ্টিক্রিয়ার সময় যায়েদ বিন সাইয়া যখন শক্তভাবে মহানবী (সা.)-এক একটি ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা দিচ্ছিল, তখন উমর (রা.)-এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল কঠোর। কিন্তু মহানবী (সা.) উমরের (রা.) মেজাজ ও চরিত্র সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি (সা.) তাকে বললেন যায়েদের পাওনা পরিশোধ করে দিতে। এমনকি যায়েদের পেরেশানির জন্য বোনাস/অতিরিক্ত হিসেবে আরো কিছু খেজুর দিতেও বললেন মহানবী (সা.)। উমর (রা.) এই আদেশ পালন করলেন এবং মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য দেখে অভিভূত হলেন। আর যায়েদও অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করলো।

যদিও তাকে উগ্র হিসেবে স্মরণ করা হয়, তার মধ্যে অন্যান্য গুণাবলীরও প্রকাশ ঘটছিল তখন। এমন একটি ঘটনা হচ্ছে, বদরের যুদ্ধের সময় তার সঙ্গীরা বিস্মিত হয়েছিল, কারণ, তিনি যুদ্ধের মন্ত্রণার সময় ইবনে আব্বাসকেও রেখেছিলেন। তার সাথীরা যখন বললো, একটি বাচ্চা ছেলেকে যুদ্ধ-পরিকল্পনার সভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে! এর জবাবে তিনি বলেছিলেন, "সে যে ভাল জ্ঞান রাখে এটা তোমরা জান।" (বুখারী)
এই ঘটনায় তার অহমিকা-শূন্যতা ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, এতে স্বল্প-বয়সী কিন্তু জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধও ফুঁটে ওঠে।
তার মেয়ে হাফসার সঙ্গে ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর বিয়ে হওয়াতে হযরত উমর (রা.) ও মহানবী (সা.)-এর সম্পর্কের বন্ধন আরো দৃঢ় হয়।
উমরের (রা.) চরিত্র সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর উচ্চ ধারণা ছিল। বহু হাদীসে উমর (রা.)-এর উচ্চতম স্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসে এর পরিচয়/উল্লেখ পাওয়া যাবে:
"শয়তান কখনো তোমার পথে মওকা পায় না। তোমার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র পথ ধরে সে।"
(বুখারী, ভলিউম ৫, ৫৭.৩২)
"তোমার বহু পূর্বে বহু জাতি ছিল যাদের লোকদের সঙ্গে [ফেরেস্তাদের মাধ্যমে] কথা বলা হয়েছে, যদিও তারা নবী ছিল না। আমার উম্মতে তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি হতো, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটি উমর ইবনে আল খাত্তাব (রা.) হতো।"
(বুখারী, ভলিউম. ৫, ৫৭.৩৮)
তফসিরকারকেরা উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত 'কথা বলা হয়েছে'-এর অর্থ করেছেন অনুপ্রেরণা লাভ করা।
"বেহেশতবাসীদের মধ্য থেকে আমি দু'জন সাহায্যকারী পেয়েছি এবং দুনিয়াবাসীদের মধ্য থেকেও দু'জন। প্রথমোক্ত দু'জন হলো জিব্রাঈল ও মিকাঈল এবং শেষোক্ত দু'জন হলো আবু বকর এবং উমর।" শেষোক্ত দু'জন সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, "এই দু'জন আমার চোখ ও কান [স্বরূপ]"। সাহাবীদের নসিহত করে তিনি (সা.) বলেন, "অনুসরণ করো তাদেরকে, যারা আমার পরে আসবে: আবু বকর এবং উমর।"

উমরের (রা.) অনুপম সাহসিকতা নিয়ে বহু ঘটনা আছে। কিন্তু যেভাবে প্রথমেই বলা হয়েছে, তিনি সুশিক্ষিতও ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে থাকাকালে তিনি ব্যাপক জ্ঞানার্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, যা তিনি পরবর্তীকালে ব্যবহার করতে পেরেছেন। ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে দেখা যায়, মহানবী (সা.) বলেছেন: "আমি যখন ঘুমাচ্ছিলাম, আমি পান করেছি-- অর্থাৎ দুধ-- ততক্ষণ পর্যন্ত দেখেছি যখন কিনা পরিতৃপ্ত হয়েছি এবং আমার নোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আর আমি তা উমরকে প্রদান করেছি।"
(বুখারী, ভলিউম ১, ৩.৮২)
যখন এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন মহানবী (সা.) এর ব্যাখ্যা করে বলেন, এটা ছিল জ্ঞান যা তিনি (সা.) উমরকে (রা.) প্রদান করেছেন।
ইসলামের প্রতি উমরের (রা.) প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। একটি ঘটনায় দেখা যায়, একবার তাবুকে একটি অভিযান পরিচালনার জন্য সাহাবাদের কাছে আর্থিক কুরবানির আবেদন জানানো হয়েছিল। উমর (রা.) তার সমস্ত অর্থ-সম্পদের অর্ধেক দান করেছিলেন। তার চেয়ে বেশি শুধু একজনই দিয়েছিলেন। তিনি আবু বকর (রা.)। তিনি তার সমস্ত অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ সম্পর্কে বলেছিলেন, "আল্লাহ এবং তার রসূলই (সা.) তাদের জন্য যথেষ্ট।"

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর ঘটনায় উমর (রা.) খুবই মুষড়ে পড়েন। তিনি কোনোমতেই এটি মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই তরবারি উত্তোলন করে কসম করে বলছিলেন, যে বলবে মুহাম্মদ (সা.) মারা গিয়েছেন, আমি তার কল্লা উড়িয়ে দেব। (তাবারি, ভলিউম ওঢ, পৃষ্ঠা ১৮৭)। তার প্রভূকে (সা.) ছাড়া এই জীবন তিনি কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারছিলেন না। মহানবী (সা.)-এর অবর্তমানে ইসলামের কী দশা হবে সেটা ভেবেও আকুল হচ্ছিলেন তিনি। এই ধরনের নৈরাশ্যজনক চিন্তাভাবনার ফলে তার মন থেকে যুক্তিবোধ উবে গিয়েছিল।

আর এই অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত আবু বকর (রা.) তাকে কুরআন থেকে পরিষ্কার আয়াত দেখিয়েছিলেন। এরপর তিনি (রা.) শান্ত হন। শিয়ারা মাঝে মাঝে বলে থাকে যে, (এসব করে) উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর দাফন-কার্যে দেরি করাচ্ছিলেন। যেন ইত্যবসরে হযরত আবু বকর (রা.) চলে এসে খলিফা হিসেবে নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু একথা সত্য নয়। (চলবে)

[The Review of Religions, November ২০০৭ অবলম্বনে]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আ.) এর রাসূল প্রেম

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অনুবাদ: তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসো তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। (এতে করে) আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী।
(সূরা আলে ইমরান:৩২)

কুরআন মজিদে মু'মিনদেরকে পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং পুরস্কারও ঘোষনা করা হয়েছে। কুরআন মজিদে ঘোষিত নেয়ামত বা পুরস্কার যদি কেউ না পেতেন তাহলে কুরআনের প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকত না। এটি আল্লাহর অপার অনুগ্রহ যে, এ উম্মতের শত শত বরং হাজার হাজার কামেল মু'মিনগণ পুরস্কার পেয়েছেন।

উপরোক্ত আয়াতে একটি পুরস্কার ঘোষনা করা হয়েছে। এটি ধর্মীয় গুরুত্বের দিক থেকে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। একজন আল্লাহর ভালবাসা পাবে এবং তার পাপ সমূহও ক্ষমা হয়ে যাবে সে আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র হবে। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে!

কুরআন মজীদে আরো এ ধরনের অনেক আয়াত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সকল প্রকার নেয়ামত বা পুরস্কার লাভ করা সম্ভব। শুধু তাই নয় বরং এ ছাড়া অন্য কোন পথও নাই। যেমন বলা হয়েছে-

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

অনুবাদঃ এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয় অনেক বড় সফলতা লাভ করে। (সূরা আহযাব:৭২)
আরো বলা হয়েছে:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

আর যে এই রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করে। (সূরা নিসা: ৮১)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সবকিছুই আঁ হযরত (সা.) এর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত। আঁ হযরত (সা.) এর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর রহমত বা কৃপা লাভের কোন সুযোগ নেই। শুধু তাই নয় বরং কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অনুবাদ: "নিশ্চয় আল্লাহ্ এ নবীর প্রতি রহমত পাঠান এবং তাঁর ফিরিশতারাও (এ নবীর জন্য দোয়া করে) হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ এবং সালাম পাঠাও।" (সূরা আহযাব: ৫৭)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর মতে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর উদ্দেশ্যে আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে দরূদ পাঠ করলে তাঁর প্রতি রুহানী ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং তাঁর (সা.) সুন্নতের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। এটি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে পরখ করার মত একটি বিষয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'আমি সত্যি সত্যি বলছি এবং নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কোন ব্যক্তি প্রকৃত নেকী বা পুণ্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না, ঐ সমস্ত রূহানী পুরস্কার বরকত গভীর তত্ত্বজ্ঞান (মারেফত)এবং রূহানী দর্শন শক্তি লাভ করতে পারে না যা পবিত্র আত্মাগুলো লাভ করে যদি না সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে গিয়ে নিজেকে নি:শেষ করে না দেয় এবং এর প্রমাণ আল্লাহর পবিত্র বাণী-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ: তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ কর (এতে করে) আল্লাহ্ও তোমাদের ভালবাসবেন। এবং আমি এর বাস্তব ও জীবন্ত প্রমাণ।'

(তফসীর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) পৃ:২০-২১)

আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্যের ফলে আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসায় বিলীন হয়ে

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ হয়ে গেছেন। কুরআনে সাহাবায়ে কেরামকে এই সনদ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি এবং তারা আল্লাহর ভালবাসায় বিলীন।

আঁ-হযরত (সা.)-এর দৃষ্টিতে

اصحابی کالنجوم (আমার সাহাবা আকাশের লক্ষত্রের মত) হয়ে গেছেন।

পরবর্তী কালে ও যুগে যুগে আউলিয়ায়ে কেরাম আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসায় নিমজ্জিত হয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর পরম সন্নিধ্য লাভ করেছেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর আবির্ভাবের কিছু কাল পূর্বে হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ, আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বুযূর্গ ছিলেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর বাণী নাযেল হয়েছে। দেখুন, হযরত শাহওলীউল্লাহ্ (রহ.)-এর কিতাব **'আততাফহিমাতুল ইলহিয়াতো'**।

বর্তমান যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) একজন **'ফানা ফিল্লাহ্'** ও **'ফানা ফিররাসূল'** ব্যক্তি।

হযরত মির্যা সাহেব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে বিভোর থাকতেন। বাল্যকাল থেকে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রেমে নিমজ্জিত ছিলেন। রাত-দিন তিনি নামায পড়তেন, যিকরে ইলাহি করতেন, দরূদ শরীফ পড়তেন, অথবা কুরআন মজীদ পাঠে রত থাকতেন। তাঁর পিতা তাকে সাংসারিক কাজে মনোযোগী করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। হযরত মির্যা সাহেব কোন ভাবেই নিজকে ইহজাগতিক বা সাংসারিক কাজে মনোযোগী করতে পারেন নি।

হযরত মিয়া ফতেহ দীন বর্ণনা করেছেন, আমি মাঝে মাঝে কাদিয়ানে হযরত মির্যা সাহেবের নিকট আসতাম। কখনও কখনও রাতেও হযরত মির্যা সাহেবের কাছে থেকে যেতাম। একবার গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম হযরত মির্যা সাহেব খুবই অস্থির। ঘুমাতে পারছেন না। তাঁর অবস্থা এমন ছিল, তাজা মাছ ডাংগায় তুলে ছেড়ে দিলে যেমন হয়। আমি চুপ করে থাকলাম।

সকালে মির্যা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাতে কেন এমন অস্থির ছিলেন? মির্যা সাহেব বললেন, যখনই আমার মনে পড়ে যায় যে, আজ ইসলামের কি অবস্থা? খৃষ্টান, হিন্দু সবাই ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমন করছে। ইসলামের পক্ষে কথা বলার কোন লোক নাই। এ-সব আমি সইতে পারি না।

(সিরাতুল মাহ্‌দী, ৪র্থ খন্ড)

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী এরফানী (রা.) লিখেছেন, ১৯২৫ইং সনে আমি লন্ডনে পাদ্রী ওয়েটের সাথে দেখা করেছিলাম যিনি এককালে বাটালা খৃষ্টান মিশনের ফাদার ছিলেন। হযরত মির্যা সম্পর্কে পাদ্রী ওয়েট বললেন যে, মির্যা সাহেবের এই বিষয়টি আমার কাছে খারাপ লেগেছে যে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি শুনলেই রেগে যেতেন। বিরোধী বা বিপরীতমতের কথা শুনার ধৈর্য্য থাকা উচিৎ। শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) পাদ্রী সাহেবকে বলেছিলেন, মির্যা সাহেবের এহেন আচরণ আপনার কাছে মন্দ লেগেছে আর আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে।

(খুতবা জুমুআ, ২১ জানুয়ারী ২০১১)।

হযরত মির্যা সাহেব সবসময় ইসলামের বিরুদ্ধে; আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ গুলোকে নোট করতেন এবং উত্তর প্রস্তুত করতেন।

এ ভাবেই অবশেষে তিনি বারাহীনে আহমদীয়া রচনা করে প্রকাশও করলেন এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ রাখলেন।

হযরত মসীহ মওউদ(আ.), আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে কোন কথা বরদাশ্‌তো করতে পারতেন না। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ(রা.) [(হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বড় ছেলে] বলেছেন, হযরত সাহেব আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি অসম্মানজনক সামান্যতম কথাও সহ্য করতে পারতেন না। সাথে সাথে তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে যেত এবং সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন। এমন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছেদ করে নিতেন।

হযরত মৌলভী শের আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'আমার সহপাঠী মোহাম্মদ আযম যিনি পীর জামাত আলী শাহের মুরীদ ছিলেন' আমাকে বলেছেন, আমার ভাই আমাকে বলেছেন, হযরত মির্যা সাহেবকে যৌবনে আমরা দেখেছি। তিনি অমৃতসরে আসতেন পাদ্রীদের সাথে ধর্ম-বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক করতেন। ঐ যুগে পাদ্রীরা হাটে বাজারে ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে বেড়াতো। হযরত মির্যা সাহেব- এর মোকাবেলা করতেন।

(সিরাতুল মাহদী ১ম খন্ড; ২৫)

হযরত মির্যা সাহেব সারাজীবন ইসলাম বিরোধীদের সাথে তর্ক যুদ্ধ করেছেন, তাঁর লেখা সমস্ত বই পত্রে এসবের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ লেখার কারণ একটাই ছিল যে, তিনি ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালবাসায় এত বেশী ডুবে ছিলেন যে, রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যৎ সামান্য কোন কথাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

আরো অনেক মৌলভী-মওলানারা দাবী করেন যে, তারাও আল্লাহর ও রাসূলের প্রেমিক। তারা আজ চিৎকার করে মজলিশ সরগরম করছে। কিন্তু আজ থেকে একশ' বছর পূর্বে পাদ্রীরা যখন হাটে বাজারে নগরে বন্দরে ইসলাম ও নবীয়ে ইসলামের (সা.) বিরুদ্ধে রাত দিন বিষোদগার করছিল, লক্ষ লক্ষ বই পত্র প্রকাশ ও প্রচার করে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে খৃষ্টান বানাচ্ছিল তখন কোন মৌলভী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্যও দেয় নি, বইও লিখেনি।

হযরত মির্যা সাহেব বারাহীনে আহমদীয়া লিখেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি আরো ঘোষনা দিয়েছেন যে, যারা আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে কথা বলে বা প্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে তিনি নিদর্শন দেখাবেন। কাদিয়ানের হিন্দুরা বললেন যে, আমাদেরকে নির্দশন দেখান। হযরত মির্যা সাহেব আল্লাহর কাছে নির্দশন চাইলেন।

আল্লাহ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে দিয়ে 'মুসলেহ মাওউদ' এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করলেন। ভবিষ্যদ্বাণী এই যে 'মুসলেহ মাওউদ' এর হাতে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের বিশাল কর্মকান্ড কায়েম

করা হবে। আজ আমরা দেখছি, সেই বিশাল কর্মকান্ড তাহরিকে জাদীদের দ্বারা ১৯৮টি দেশের প্রায় ২০ কোটি মানুষ মির্যা গোলম আহমদ (আ.)-এর অনুসারী হয়েছে এবং তাকে ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ বলে ঈমান এনেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এমন রাসূল প্রেম দেখে আল্লাহ্ তাঁকে এ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হিসাবে মনোনীত করেছেন। বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থ পাঠ করে দেখুন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জাগ্রত অবস্থায় দিব্য দর্শনের মাধ্যমে আঁ হযরত (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন,

"একরাতে খাকসার আঁ হযরত (সা.)-এর উদ্দেশ্যে দরূদ পাঠ করতে করতে এতো বেশী দরূদ পাঠে রত হলাম যে, এমন কি আমার মন প্রাণ দরূদের রূহানী প্রভাবে বিমোহিত হয়ে গেল। তারপর স্বপ্নে দেখলাম ঐশী নূর ভরতি মশক (ব্যাগ) একের পর এক এই খাকসারের গৃহে নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের একজন বলল, এগুলো ঐ বরকত বা কল্যাণ যা তুমি দরূদ আকারে আঁ হযরত (সা.)-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছ।"

আরও একটি ঘটনা মনে পড়ল। একবার ইলহাম নাযেল হোল যার অর্থ এই যে, উর্ধ্বোলোকে আলোচনা চলছে, আল্লাহ্‌র প্রবল ইচ্ছা এই যে, তিনি ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। কিন্তু উর্ধ্বোলোকে ধর্মকে পুনর্জীবন দানকারী কে হবেন তা এখনও নির্ধারিত হয়নি। ইতিমধ্যে স্বপ্নে দেখলাম, লোকেরা ধর্মের পুনর্জীবন দানকারী কে হবেন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং এক ব্যক্তি এই খাকসারের সামনে এসে ইংগিত করে বলল,

هذا رجل يحب رسول الله

'এই সেই ব্যক্তি যে আঁ হযরত (সা.)-কে (সত্যিকার অর্থে) ভালবাসেন। এর অর্থ ছিল এই যে, ধর্মকে পুনর্জীবিত কারীর জন্য প্রধান শর্ত ছিল, আঁ হযরত (সা.)-কে গভীরভাবে ভালবাসা, যা এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।"

(বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৫০৩, রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড, নব সংস্করণ, পৃ: ৫৯৮, টীকার পাদ টীকা নং ৩)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো লিখেছেন,

একরাতে আমি লিখছিলাম। হঠাৎ ঘুম এসে গেল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর আঁ হযরত (সা.)-কে দেখলাম।

হুযূর (সা.)-এর চেহারা খুব উজ্জল আলোকিত দেখাচ্ছিল। তিনি (সা.) আমার কাছে আসলেন, আমি অনুভব করলাম, হুযুর (সা.)আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করতে চান। তিনি আমাকে (জড়িয়ে ধরলেন) আলিঙ্গন করলেন। আমি দেখলাম তার (সা.) চেহারা থেকে নূরের কিরণ বেরিয়ে আমার ভেতর প্রবেশ করছে।

আমি ঐ নূরের কিরণ ধারাকে কেবল আধ্যাত্মিক চোখেই নয় বরং বাহ্যিক আলোর মতই দেখছিলাম। আর আঁ হযরত (সা.) আমাকে আলিঙ্গন করছেন দেখলাম বটে, কিন্তু আমার থেকে পরে তাঁকে (সা.) পৃথক হতে দেখলাম না। বুঝতে পেলাম না যে তিনি আমার থেকে পৃথক হয়েছেন।

তারপর আমার প্রভু রাব্বুল আলামীন আমাকে ইলহাম করলেন: **'ইয়া আহমাদো বারাকাল্লাহো ফিকা, ওয়া রামায়তা ইয রামায়তা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা'** অর্থাৎ হে আহমদ। আল্লাহ্ তোমাকে বরকত মন্ডিত করেছেন। তুমি ছুড়ো নাই যখন তুমি ছুড়েছ। কিন্তু আল্লাহ্ ছুঁড়েছেন। (তাযকেরাহ: পৃ:৪৩)

এ সব ঘটনা সবই ১৮৮২ইং সনের ঘটনা। এবং এর থেকে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্ হযরত মির্যা গেলাম আহমদ (আ.)-কে এ যুগের ইমাম তথা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হিসাবে মনোনিত করেছেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর পক্ষে বিগত একশ' বছরে আল্লাহ অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়েছেন।

খাকসার যা ব্যক্ত করতে চাচ্ছি তা এই যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) পুরোপুরি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে বিলীন হয়ে গিয়েছেন তারপর মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হিসাবে তাকে মনোনীত করা হয়েছে।

আল মাহদী অর্থ হলো, যিনি হযরত হাদীয়ে আযম (সা.)-এর আনুগত্যের মাঝে নিজকে বিলীন করেছেন। আঁ হযরত (সা.) এর আনুগত্য ও ভালবাসায় বিলীন হওয়া ব্যতীত মাহদী হওয়া কোন দিনই সম্ভব ছিল না। দুনিয়ার মানুষ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সম্পর্কে কী ভাবল বা বলল এটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো আল্লাহ কি বলেছেন আর তিনি কি মির্যা সাহেবের কার্যক্রমকে সমর্থন করছেন? না কি করেন নি।

আল্লাহ বলেছেন, তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কে প্রতিশ্রুত মাহদী মনোনীত করেছেন এবং হাজার হাজার দৈববাণী বা ইলহাম বা ওহী নাযেল করেছেন। অন্যান্য হাজার হাজার ওলী আল্লাহ্‌র প্রতিও ওহী-ইলহাম নাযেল করেছেন, আর এখনও করছেন। আজকের মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে যেন মান্য করা হয়।

প্রথম দিন থেকেই মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ তাকে অস্বীকার করেছে, মুসলমান মৌলভী মওলানা, খৃষ্টান, পাদ্রী, হিন্দু, বৌদ্ধ সবাই অস্বীকার করেছে। প্রচন্ড বিরোধীতা চলেছে এবং আজও চলছে।

অপরদিকে কোটি কোটি মানুষ তাকে মেনে নিয়েছেন। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে গ্রহণ করে চলেছে। আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বলেছেন,

'ইয়ানসুরুকা রিজালুন নূহই ইলায়হিম মিনাস্ সামায়ে'

অর্থঃ এমন ব্যাক্তিবর্গ তোমাকে সাহায্য করবেন যাদের প্রতি আমরা আকাশ থেকে ওহী করছি।

এই ইলহামের ব্যাখ্যা এই যে শত শত মানুষ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে ইঙ্গিত(ইলহাম) পেয়ে আহমদীয়াত গ্রহন করেছেন এবং এখনো করছেন। এর মাধ্যমে জগদ্বাসীকে পয়গাম দেয়া হয়েছে, যে কেউ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে ভালবেসে অনুসরন করে আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। আর যারা আঁ হযরত (সা.) কে অনুসরন করবে না তারা

অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন:

"আজ মানব জাতির জন্য এই দুনিয়াতে কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানদের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ব্যতীত কোন রাসূল এবং শাফী নাই। অতএব, তোমরা সেই মহা গৌরবের অধিকারী নবীর সাথে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হও; আর অন্য কাউকেই তাঁর উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যেন তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গন্য হও।" (আমাদের শিক্ষা)

কুরআনের ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বিগত ১০০০/১২০০ বছরে মুসলমান অধ:পতনে নিচে নামতে নামতে আজ সবচেয়ে নিগৃহীত জাতি। মুসলমান জাতি, যে জাতি ৭০০/৮০০ বছর ধরে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, আজ তারা দাসত্ব করছে। বিগত দু'তিনশ' বছরে ইসলামের ও মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে কোটি কোটি বই লেখা ও ছাপা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ব্যতীত কেউ সাহস করে সামনে এগিয়ে আসে নি।

হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রায় ৯০ খানা বই লিখেছেন। কোন একটি বই পড়ে দেখুন; তিনি (আ.) কিভাবে ও কত উত্তমরূপে জোড়ালো ভাষায় যুক্তি-প্রমাণসহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে আরোপিত দূর্নাম, অপবাদ, আপত্তি ও অসভ্য অপপ্রচারকে খন্ডন করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সর্বোচ্চ মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভেজ্ দরুদ উস মুহসেন পর্ তু দিন মে সও সও বার

পাক মুহাম্মদ মুস্তফা নাবীয়্যুঁ কা সারদার

অর্থঃ তুমি এই মহান দয়াবানের (সা.) প্রতি দিনে শত শত বার দরুদ পাঠ করো পবিত্র মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) যিনি নবীগণের সরদার।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সম্মানে আরবী কাসিদার একটি পংক্তিতে বলেন,

يا عين فيض الله و العرفان
يسعىٰ اليک الخلق كالظمان

" হে আল্লাহর কল্যাণ ও তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রস্রবণ ধারা! তোমার দিকে পিপাসায় কাতর মানুষ ছুটে আসছে!

আরেকটি ফার্সী পংক্তিতে তিনি বলেন,

ایں چشمہء رواں کہ بخلق خدا دہم
یک قطرہ ز بحر کمال محمداست

এ তো মুহাম্মদ (সা.) এর মহান মর্যাদার মহা সমুদ্রের এক বিন্দুমাত্র, যার খবর আমি মানবজাতিকে দিচ্ছি।

তিনি আঁ-হযরত (সা.) এর আনুগত্যে ও ভালবাসায় নিজকে বিলীন করে দিয়েছেন যার কারণে তাঁকে ইমাম মাহদী মনোনীত করা হয়েছে, বিশ্বের বুকে ইসলামের ও মহানবী (সা.)-এর শান্তির বাণী ও অমর জীবনের বাণী যেন তিনি পৌঁছে দেন।

আপনারা বিচার বিশ্লেষন করে দেখুন, তিনি কী করেছিলেন এবং তারপর তাঁর খলীফাগণ কি করছেন। আপনারা আমাদের খলীফাগণের খুতবা, বক্তৃতা পড়ে দেখুন। প্রত্যেক যুগে ইসলাম বিরোধী সকল কর্মকান্ডের প্রতিবাদ ও জবাব দেয়া হয়। বিরোধীরা বিরোধিতা করেই চলেছে।

কিন্তু আমরা আমাদের কাজ করে চলেছি। আমাদের কাজ ইসলাম ও নবীয়ে করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদ দূর করা। যখন কোথাও কেউ ইসলাম বা নবীয়ে করীম (সা.) এর বিরুদ্ধে কিছু বলে বা লিখে সাথে সাথে আমাদের জামাতের পক্ষ থেকে তার সমুচিত জবাব দেয়া হয়।

আমাদের কোন জাগতিক শক্তি নেই। কিন্তু আমাদের সাথে আছে আল্লাহর বিরাট সমর্থন– যদ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবী সত্য, আল্লাহ তাকে ইমাম মাহদী বানিয়েছেন এবং এর কারণ এই যে, তিনি আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক। আর কুরআনের আয়াতে আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে সিক্ত হয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর (সা.)-এর অনুসরণ কর।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, " আমি তাঁর (আল্লাহর) কসম করে বলছি, তিনি যেমন হযরত ইব্রাহিম (আ.) ... হযরত ইসহাক (আ.) ... নবীগণের সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন এবং সর্বোপরি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন এবং সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং পবিত্র ওহী তাঁর (সা.) উপর নাযিল করেছিলেন– এমনই আমাকেও তিনি পবিত্র বাণী বা ইলহাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

আমার এ সম্মান শুধু আঁ-হযরত (সা.)-এর অনুসরনের কারনে লাভ হয়েছে। আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসরন না করতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বতের সমান আমার পূণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হতো তাহলেও আমি কখনো খোদার সাথে বাক্যালাপ ও তাঁর ইলহাম লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না।

আমার ঐশীবাণী বা ইলহাম লাভ এক বাস্তব ঘটনা। যদি আমি এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি তাহলে আমি কাফের হয়ে যাব আমার পরকাল নষ্ট হয়ে যাবে। [তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃ.১৮১]

অতএব, মানুষ জানে না। যিনি প্রায় প্রতিদিনই ঐশীবাণী প্রাপ্ত হতেন, দুনিয়ার মানুষের ভয়ে ভীত হয়ে তিনি নিজ দাবী হতে সরে আসতে পারেন না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর পূর্বেও যুগে-যুগে আঁ-হযরত (সা.)-এর অনুগতরা ইলহাম বা ঐশীবাণী লাভ করেছেন। এমন যুগ ছিল না যখন মুসলিম উম্মতে অসংখ্য ঐশীবাণীপ্রাপ্ত বুযূর্গ ছিলেন না।

কারণ আজ কুরআনের সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, কুরআনের অনুসারীরা সর্বদা কুরআনে বর্ণিত পুরস্কার লাভ করেছেন আর করতে থাকবেন। যারা আঁ-হযরত (সা.) এর প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে পদে পদে তাঁর (সা.)-এর অনুসরণ করবেন তারা ঐশী শুভ সংবাদ লাভ করবেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আল্লাহর প্রিয়

এবং মুসলমানদের এ যুগের ইমাম মাহদী। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমার সর্ম্পকে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা কর। আল্লাহ তোমাদের বলে দিবেন যে, আমি অবশ্যই সত্য দাবীকারক।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আল্লাহর রসূলের ভালবাসায় কিভাবে বিভোর ও বিমোহিত ছিলেন যা তার সমস্ত লেখার মাঝে প্রকাশিত। এখানে তাঁর লেখা থেকে কয়েকটি উদ্বৃতি পেশ করছি–

"কিন্তু যারা আল্লাহকে ভয় না করে অন্যায়ভাবে আমাদের বুযূর্গ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) কে মন্দ ভাষায় স্মরণ করে, হুযুর (সা.)-এর প্রতি অপবিত্র অপবাদ আরোপ করে, খারাপ ভাষা ব্যবহার থেকে বিরত হয় না– আমরা তাদের সাথে কীভাবে সন্ধি করতে পারি?

আমি সত্য সত্য বলছি, আমরা মরুভূমির সাপ, জঙ্গলের হায়েনাদের সাথে সন্ধি করতে পারি – কিন্তু তাদের সাথে সন্ধি করতে পারি না যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী, আমাদের পিতা-মাতার চেয়ে অধিক প্রিয় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অসভ্য আক্রমণ করে। খোদা আমাদেরকে ইসলামের মধ্যে মৃত্যু দান করুন। আমরা এমন কিছু করতে চাই না যার কারণে আমাদের ঈমান চলে যায়। (পয়গামে সুলহে, পৃ.২০)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম গ্রন্থে লিখেছেন,

"এটা কি সত্য নয় যে, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এই হিন্দুস্থানেই প্রায় এক লক্ষ লোক খৃষ্টান হয়ে গেছে? এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ছয় কোটিরও বেশী বই-পুস্তক রচনা করা হয়েছে? এবং বড় বড় সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা নিজেদের পবিত্র ধর্মকে বিসর্জন দিয়েছে? এমনকি যারা নিজেদেরকে রাসূল (সা.)-এর বংশধর বলে দাবী করতো তারাও খৃষ্টান ধর্মের ধর্মীয় পোষাক পরিধান করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শত্রু হয়ে গেছে?

এবং তারা এমন মিথ্যা অপবাদ ও অবমাননা এবং বদনাম ভরা বই-পুস্তক নবী করিম (সা.)-এর বিরুদ্ধে ছাপিয়ে প্রকাশ করেছে যা শুনলে গা শিউরে উঠে, এবং হৃদয় কেঁদে কেঁদে এ সাক্ষ্য দেয়, যদি এ সকল লোক আমার ছেলে মেয়েদেরকে আমার চোখের সামনে হত্যা করতো এবং আমার প্রাণ প্রিয় আত্মীয়-স্বজনদেরকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতো এবং অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও যন্ত্রনা দিয়ে আমাকে হত্যা করতো এবং আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন ও দখল করে নিত, তাহলেও আল্লাহর কসম! আল্লাহর কসম! আমার এতো দুঃখ হতো না এবং আমি হৃদয়ে এরুপ দুঃখ পেতাম না যেরুপ দুঃখ আমি পাই, তাদের সেই সব গালমন্দ ও অপমানকর কথা, যা তারা বলে আমার রাসুল করিম (সা.)-এর বিরুদ্ধে।

[আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ. ৫১-৫২]

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) শুধু যে বলেছেন বা লিখেছেন তা নয়, বরং তিনি প্রতিদিন শয়নে-স্বপনে, জাগরনে উঠতে-বসতে হযরত নবীয়ে করিম (সা.)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করেছেন। সবাই স্পষ্টত অনুভব করেছেন ও দেখেছেন। যদি তিনি, হুযূর (সা.)-এর প্রেমিক না হতেন তাহলে এমন লিখতে পারতেন না।

হযরত মৌলবী আব্দুল করিম শিয়ালকোটি (রা.) বর্ণনা করেছেন, একদিন দেখলেন হুযুর (আ.) মসজিদের মধ্যে পায়চারী করছেন। খুব আস্তে আস্তে হযরত হাসসান বিন সাবেত (রা.) এর পংক্তি পড়ছেন,

কুনতাস্ সোয়াদা লেনাযেরি ফা আমেয়া আলায়কান্ নাযেরু

ফামান্ শাআ বা'দাকা ফাল্ ইয়ামুত্ ফা আলায়কা কুনতো উহাযেরু।

তুমি আমার চোখের পুতলি ছিলে, তোমার মৃত্যুতে আমি অন্ধ হয়ে গেছি, তোমার পরে যে মরে মরুক আমার কিছু যায় আসে না, আমি তোমার জন্য ভীত ছিলাম।

হুযুর (আ.) এর চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছিল। বলেছিলেন, হায়! আমিও যদি এমন কাসীদা লিখতে পারতাম। অথচ হুযুর (আ.)-ও অত্যন্ত মূল্যবান আরবী সুদীর্ঘ কাসীদা, কবিতা, নযম ইত্যাদি রচনা করেছেন।

হযরত সৈয়দা নওয়াব মোবারেকা বেগম (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন, একবার মহর্‌রমের সময় কারবালার ঘটনা হযরত আকদাস (আ.) বলছিলেন ছেলে-মেয়েদের সামনে। হযরতের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছিল। ইয়াযিদকে পলীদ বা নাপাক বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

[সিরাতুল মাহদী, সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান ১৯ আগষ্ট ১৯৯৩]

* একবার এক সফরকালে হযরত আকদাস (আ.) লাহোর ষ্টেশনে ওযু করছিলেন। এমন সময় পন্ডিত লেখরাম এসে হযরত (আ.) কে সালাম করলেন। একবার -দুবার তিনবার সালাম করলেন।

কিন্তু হযরত (আ.) সালামের উত্তর দিলেন না চেয়েও দেখলেন না পন্ডিতজী তখন চলে গেলেন। এরপর মৌলবী আব্দুল করিম (রা.) হুযূর (আ.) কে বললেন- লেখরাম আপনাকে সালাম করতে এসেছিল। হযরত আকদাস বললেন, সে আমার প্রিয় নবী করিম (আ.) কে গালি-গালাজ করে আর এসে আমাকে সালাম করে?

[সিরাতে মসীহ মাওউদ (আ.), পৃ. ২৭২]

হযরত মির্যা বশির আহমদ কামরুল আম্বিয়া (রা.) আল্লাহর শপথ করে বলেছেন, আমি সব সময় লক্ষ্য করেছি যখনই আঁ-হযরত (সা.) এর নাম আসতো বা তিনি শুনতেন তাঁর চোখ দিয়ে পানি এসে যেত।

(যিকরে হাবিব, পৃ. ২৯)

হযরত মির্যা সুলতান আহমদ (রা.) যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর বড় ছেলে হওয়ার কারণে হুযূর (আ.) এর যৌবনকাল থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছেন, তিনি বলেছেন, " তিনি হুযূর (সা.) সর্ম্পকে কোন মন্দ কথা সহ্য করতে পারতেন না। যদি তিনি কারো কাছ থেকে কোন মন্দ কথা শুনতেন তাহলে তার চেহারা রক্তিম হয়ে যেত এবং তিনি সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন এবং তার সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করতেন।

(সিরাতুন নবী ১ম খন্ড)

পাদ্রী আব্দুল্লাহ আথমের সাথে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মুবাহাসা হয়েছিল পনের দিনের। যা জঙ্গে মুকাদ্দাস নামে পরিচিত। মুবাহাসা শেষে পাদ্রীরা হযরত (আ.) কে চা পানের নিমন্ত্রন করেছিলেন। হযরত (আ.)

সে নিমন্ত্রন গ্রহণ করেন নি। কারণ তারা তো আঁ-হযরত (সা.) এর বিরুদ্ধে প্রচার চালাতো।

একবার হিন্দু আর্য সমাজিরা তাদের এক ধর্ম সম্মেলনে হযরত (আ.)কে নিমন্ত্রন করেছিল। হযরত (আ.) তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে তারা আঁ-হযরত (সা.) এর প্রতি কোন প্রকারের অসম্মানজনক কথা বলবেন না।

হযরত (আ.) কোন কারণে ঐ সম্মেলনে যান নি। তিনি তাঁর কয়েকজন সাহাবায়ে কেরামকে পাঠিয়েছিলেন। হিন্দুরা তাদের অঙ্গীকার রাখে নি। তারা আঁ-হযরত (সা.) এর বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকে। হযরত (আ.) যখন এ কথা শুনলেন তখন তিনি খুব দুঃখ পেলেন। আর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে খুব শক্তভাবে বললেন, তারা কেন সম্মেলন ছেড়ে উঠে আসলেন না।

[সিরাত মসীহ মাওউদ (আ.) পৃ. ২৭৩]

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জীবনে এমন কোন মুহূর্ত আসেনি, কোন কথা এমন বলেন নি, কোন কাজ এমন করেন নি যা আঁ-হযরত (সা.) এর সুন্নতের বাইরে হতে পারে। স্ত্রী-পরিবার, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশি, বন্ধু-শত্রু সকলের সাথে তিনি সৎ ব্যবহার করেছেন। কোন ক্ষেত্রেই তিনি আঁ-হযরত (সা.) এর আনুগত্যের বাইরে যান নি।

হযরত (আ.) ছোট-বড় সকলকে সালাম করতেন। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই প্রথমে সালাম করতেন। হযরত ডা. আতরউদ্দীন (রা.) বর্ণনা করেছেন, "আমি তখন খুব ছোট, পায়ে জুতাও ছিল না। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। হযরত (আ.) আমাকে সালাম করলেন। আমি এ কথা আজও ভুলি নি। হযরত (আ.) মজলিস থেকে উঠে যাবার সময় সালাম বলে যেতেন- কয়েক মিনিট পরে আবার ফিরে আসতেন আর তখনও সকলকে পুনরায় সালাম করতেন।

[সিরাতুল মাহদী, ৩য় খন্ড, পৃ.৫২]

হযরত (আ.) জীবনের প্রতিদিনের সকল কাজকর্মকে দেখলেই একজন ব্যক্তি বুঝতে পারতো তিনি (আ.) হুযুর (সা.) এর কতোবড় প্রেমিক। তাঁর প্রতিটি কাজই হযরত (সা.) এর সুন্নত অনুসারে হতো।

একবার তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন। কেউ একজন একগ্লাস পানীয় পেশ করলে হযরত (আ.) সাথে সাথে বসে যান তারপর তিনি পানি পান করেন।

"হাম হুয়ে খায়রে উমাম তুঝসে হি আয় খায়রে রসুল
তেরে বাড়নে সে কদম আগে বাড়হায়া হামনে"
অর্থাৎ হে শ্রেষ্ঠ রাসূল ! তোমারই কারণে তো আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হয়েছি;
তোমার অগ্রসর হওয়াতে আমরাও সামনে অগ্রসর হয়েছি।
"কাফের ও মুলহেদ ও দাজ্জাল হামে কেহ্‌তে হ্যাঁয়
নাম কিয়া কিয়া গামে মিল্লাত মে রাখায়া হামনে"

অর্থাৎ, কাফের, মুলহেদ ও দাজ্জাল নামে আমাকে ডাকা হয়
মুসলিম উম্মাহর খাতিরে কত প্রকার নামই না রাখা হয়েছে আমার।
"তেরি মুহ্ কি হি কাসম মেরে পেয়ারে আহ্‌মদ
তেরি খাতের সে ইয়ে সাব বার উঠায়া হামনে"
অর্থাৎ, হে আমার প্রিয় আহমদ ! তোমার মুখের শপথ
তোমার খাতিরে এ সমস্ত বোঝা আমরা বহন করছি

"মুস্তফা পর্ তেরা বেহাদ হো সালাম আওর রহ্‌মত
উস্‌সে ইয়ে নূর লিয়া বারে খোদায়া হামনে"
অর্থাৎ, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর প্রতি তোমার সালাম ও রহমত হোক
যাঁর থেকে আমরা নূর পেয়েছি
আল্লাহ্‌র কসম
"আও লোগো কেহ এহিঁ নূরে খোদা পাওগে
লো তুমহে তওরে তাসাল্লি কা বাতায়া হামনে"

অর্থাৎ, এসো হে লোক সকল! এখানেই পাবে খোদার জ্যোতি
দেখ আমরা তোমাদের শান্তির পথ বলে দিলাম।
উস নূর পার ফিদা হুঁ উসকা হি ম্যায় হুয়া হুঁ
উও হ্যায় ম্যায় চিজ কেয়া হুঁ বাস্ ফয়সালা এহি হ্যায়
অর্থাৎ, ঐ নূরের মাঝে আমি নিজেকে বিলীন করেছি– আমি তাঁরই হয়ে গিয়েছি
তিনিই সব কিছু– আমি তো কিছুই না–
এটা চুড়ান্ত ও শেষ কথা।

তিনি যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর খাঁটি প্রেমিক না হতেন তাহলে আজ আহমদীয়া জামাত বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করত না। তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণ হতো না।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ।

(আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৮৭তম সালানা জলসায় প্রদত্ত ভাষণ)

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।"

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শিখ ধর্ম-মতের জন্মকথা

- মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

গুরু নানক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় মতবাদ "শিখ মতবাদ" নামে পরিচিত। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে গুরু নানকের জন্ম হয়। সাধারণভাবে এই মতবাদকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের শিক্ষার মধ্যে আপোষ-মীমাংসার ফলশ্রুতি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু শিখ মতবাদের সযত্ন অধ্যয়ন এবং এর সংরক্ষিত স্মৃতি চিহ্নাদি অখন্ডনীয় এ উপসংহার পৌঁছে দেয় যে, গুরু নানক হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন এবং ইসলামের শিক্ষাসমূহকে এমন এক সীমা পর্যন্ত উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রাথমিক অবস্থায় শিখ মতবাদকে ইসলামেরই এক সম্প্রদায় হিসেবে দেখা যেতে পারে। জন্মসূত্রে বাবা নানক ছিলেন হিন্দু।

হিন্দু মতবাদের নমনীয়তা এমন সীমারেখা টেনে দেয় যার ফলে মানুষ হিন্দু হতে পারে না। হিন্দু মতবাদে কারো বিশ্বাসের ঘাটতি জীবন পদ্ধতি ও প্রথা বা সংস্কার দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি কেউ এমন মাত্রায় কোন মুসলমানের সাথে মেলামেশা করে যে, সে তাদের সাথে খাবার খায়, পান করে এবং প্রকাশ্যে ইসলামের অনুষ্ঠানাদিতে যায়, তবে এমন কাউকে হিন্দু সমাজে কখনও বরদাস্ত করবে না।

শিখ মতবাদের পুরো ইতিহাস পাঠে জানা যায় এর প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও মুসলমানদের সাথে মেলামেশা করতেন, তাদের প্রার্থনায় যোগদান করতেন এবং প্রকাশ্যে ইসলামের অন্যান্য সব বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। নিজের উপর তিনি হিন্দুদের বাহ্যিক পরিচ্ছদের কোন চিহ্নই পরিধান করেন নি। অপরপক্ষে তিনি মুসলমানদের পোষাক পরিধান করতেন এবং একজন মুসলমান ফকিরের পরিচায়ক সব তকমা নিজের উপর আঁটতেন।

মুসলমান পীর দরবেশদের সাথে তিনি তার দিনসমূহ কাটাতেন এবং তাদের সাথেই পানাহার করতেন। একজন মুসলমান সূফীর উপদেশ গ্রহণের জন্য তিনি প্রতিনিয়ত তার কাছে যেতেন এবং তার জীবনে এমন একটি উদাহরণ নেই যে, তিনি কোন হিন্দু পন্ডিতের কাছে কখনো মাথা নত করেছেন। তার নামের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে তিনি চিল্লা (ইসলামী পন্থায় কৃত ধ্যান-এর নাম) সম্পন্ন করেছেন বলে জানা যায়। পাঞ্জাবের সার্সা নামক এক ছোট শহরে নানকের সম্পাদিত চিল্লা হচ্ছে এর এক উদাহরণ। মুসলিম দেশসমূহ সফরের মাধ্যমে তিনি মক্কায় পৌঁছেন এবং হজ্জব্রত পালন করেন।

এটাও জানা যায় যে, তিনি পবিত্র মদীনা শহরও পরিদর্শন করেন। এসব ভ্রমণে তিনি তার সবচে' বেশী পছন্দের মুসলমান বন্ধু শেক ফরিদকে সাথে নিয়েছিলেন, যার সাহচর্যে তিনি তার জীবনের ১২টি বছর অতিবাহিত করেন। হজ্জ পালনের সময় বাবা নানক হাজীদের পোশাক পরিধান করেছিলেন এবং হাতে ছড়ি, সাথে পবিত্র কুরআন, জায়নামায ও গোসলের জন্য পানির জগ বহন করেছেন। এমনকি, তার প্রথম চারজন উত্তরাধিকারীকে ছবিতে মুসলমান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে, যাদের হাতে তসবি শোভা পেত।

এক মুসলিম পরিবারে গুরু নানক বিয়ে করেছিলেন। এ বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ, কোন খ্যাতিমান মুসলিম পরিবারই গুরু নানককে তাদের জামাতা হিসেবে গ্রহণ করতো না, যদি না তিনি মুসলমান হিসেবে পরিচিত হতেন। নানক মুসলিম শাসিত এক দেশে বাস করতেন, যেখানে কোন মুসলিম মহিলার বিবাহ কোন অমুসলিমের সাথে সম্পন্ন হওয়া কোনভাবেই সহ্য করা হতো না। এতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, গুরু নানককে তার সমসাময়িক কালের লোকেরা মুসলমান বলেই জানতো।

যে "চোলা'টি, অর্থাৎ বাবা নানকের আল খিল্লাটি গুরুর সবচে' পবিত্র ও সংরক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন ছিল এবং পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার এক ক্ষুদ্রগ্রামে 'ডেরাবাবা নানক'-এ তা সংরক্ষিত আছে। এটা সেই আলখিল্লা, যেটা নানক তার জীবদ্দশায় পরিধান করতেন এবং এটাকে এতোই পবিত্র জ্ঞান করা হয় যে, নানকের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকে অনুসারীরা এটাকে সুরক্ষা করার জন্য সার্বিক যত্ন নিতেন।

শিখ সম্প্রদায় কর্তৃক যে শ্রদ্ধা ও তাজিম এই চোলার প্রতি প্রদর্শিত হয়েছে, তা এই আলখিল্লাটির বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য বহন করে। শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থ সাহেব'-এ ধারনকৃত গুরু নানকের বাণীসমূহ ৫ম গুরু, গুরু অর্জন দেব-এর পূর্বে আর কারো দ্বারা সংগৃহীত হয়নি এবং বিশেষত: এ কারণেই এটাকে বিশুদ্ধ বলে বিশ্বাস করা যায় না যে, ততদিনে শিখ মতবাদ ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার মনোভাব পোষণ করা শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু ঐ আল খিল্লাটি সে অভিযোগ থেকে মুক্ত, কারণ এটা নানকের হাতের তৈরী ছিল এবং আদি রূপে আমাদের সময় পর্যন্ত চলে এসেছে। সাধারণভাবে এ অভিযোগ দাঁড় করানো হয় যে, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ভাষায় রচিত আয়াতসমূহ এ চোলার উপর লিখা হয়েছে। কিন্তু এ অভিযোগ সত্য নয়। সম্প্রতি গৃহীত ফটোগ্রাফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চোলার গায়ে লিখার জন্য যেসব আয়াত বেছে নেয়া হয়েছে, সেগুলো কুরআন থেকে উদ্ধৃত। নানক কর্তৃক আচরিত ধর্মটি ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম ছিল না।

কিন্তু চোলার ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনকভাবে যেমন ভ্রান্ত ধারণা সমূহ গুরুত্ব পেয়েছে, সেই একই রকম ভাবে বাবা নানকের শিক্ষা সমূহ সম্পর্কেও অনেক ভ্রান্ত ধারণা গুরুত্ব পেয়েছে, যেগুলোকে সম্পূর্ণ ইসলামী শিক্ষা হওয়া সত্ত্বেও পরিণামে 'হিন্দু মতবাদ ও ইসলামের মধ্যে 'আপোষ-মীমাংসার রূপে ধরে নেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সাথে বাবা নানকের শিক্ষার সাদৃশ্য এতোই নিখুঁত যে, কেউ এমন মন্তব্য না করে পারবে না যে, গুরু নানক নিজ ধর্ম হিসেবে ইসলামকেই বেছে নিয়েছিলেন।

তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, খোদা একক সত্তা এবং তিনিই সবার উপাস্য এবং তিনি নিরাকার। এমন আর কেউ নেই, যে তার সমকক্ষ। তিনিই এ বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তার দ্বারাই সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সৃষ্টির সকল পর্যায়ের চূড়ান্ত নির্ধারক।

শিখ মতবাদ একক এবং নিরাকার খোদায় বিশ্বাস করে মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করে না তবুও এ মতবাদ মূর্তিপূজা, খোদার সাথে অন্য কিছুর অংশিবাদিতাকে উৎসাহিত করে। খোদা নিজেকে কোন মূর্তি অথবা পাথরের মধ্যে সীমিত করতে পারেন না। খোদা সব কিছুর নাগালের বাইরে আবার একই সাথে তিনি সব কিছুতেই বিদ্যমান।

শিখ মতবাদ অবতারে বিশ্বাস করে না, অর্থাৎ মানবতাকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে কারো অবতরন করার আবশ্যকতায় বিশ্বাস করে না। অপরপক্ষে এটা বিশ্বাস করে যে, এমন মানুষ রয়েছে, যারা সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার অধিকারী, বালা সাহেব রচিত কেতাব 'জনম সখি' হচ্ছে শিখ মতবাদের এক প্রামাণিক উৎস। বালা ছিলেন নানকের একজন সার্বক্ষণিক সহচর এবং ভ্রমণ কাল ২৪ বছর ধরেই তিনি তার গুরুকে সঙ্গ দান করেন। এটা সত্য যে, 'জনম সখি'তে যে কেউ অনেক সত্য ঘটনার সাথে অলীক কাহিনীর সংমিশ্রণ দেখতে পাবেন। বালা ছিলেন একজন হিন্দু এবং নানকের মৃত্যুর পরই ইসলাম থেকে শিখ মতবাদের বিচ্ছিন্নতা শুরু হয়েছিল। এজন্যে 'জনম সখি'-তে ইসলামের স্বপক্ষে ধারণকৃত যে কোন বিবৃতিতে বিরোধী সাক্ষ্যের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

বালা সাহেব রচিত 'জনম সখি'-এর ৩য় সংস্করণ, যা এ শতাব্দীর (বিংশ) প্রথমাংশে লাহোরের আনারকলি প্রেস থেকে মুদ্রিত, তা থেকে একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল :–

'জনম সখি'-র ১৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'কুরআন ৩০ পারায় বিভক্ত, তুমি একে পৃথিবীর চার কোণায় প্রচার কর। শুধু একটি নামের মাহাত্ম্যই ঘোষণা কর, কারণ আমার কোন সহযোগী নেই। খোদার কেবল সেই বাক্যই নানক ঘোষণা করে, যা তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। তোমাকে শিখ-এর মর্যাদা দান করা হয়েছে, সুতরাং তোমার উচিত বহু-ঈশ্বর-ঈশ্বরীর পূজা করার প্রথা এবং পুরনো হিন্দু মূর্তি-মন্দির সমূহ বিলোপ করা।

'জনম সখি' বইতে ইসলাম ধর্মের মৌলিক বস্তু 'কলেমা'-র উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

"আমি একটি 'কলেমা'র পুনরাবৃত্তি করেছি, অন্য আর কেউ নেই"।

"যারা কলেমাটি পুনরাবৃত্তি কর এবং বিশ্বাসহীন নয়, তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে না"।

"নবীর পবিত্র কলেমাটির পুনরাবৃত্তি করে, এটা তোমার সব পাপ ধুয়ে দেবে"।

"কলেমার পুনরাবৃত্তি করে করে ইহজগত ও পরকালের শাস্তিকে দূর করো"।

"যে ব্যক্তি কলেমার পুনরাবৃত্তি করে, তাকে কিভাবে শাস্তি দেয়া হবে! কলেমা পুনুরাবৃত্তি করার গুণ হলো, এ দ্বারা একজন মানুষ পাপ থেকে নিষ্কৃতি পায়"।

বালার 'জনম সখি'-তে আমরা আরো পাঠ করি যে, মক্কায় তীর্থযাত্রা করা কালে বাবা নানক ইমাম কাজী রুকন উদ্দীনের সাথে সাক্ষাত করে ছিলেন এবং তার সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। বলা হয়েছে যে, নানক বলেছিলেন, "হে রুকুনদ্দীন, পবিত্র কুরআনে লিখা আছে যে, যারা মদ অথবা ভাং পান করে বিচার দিবসে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে"।

বাবা নানক শুধু বিশ্বাসেই একজন মুসলমান ছিলেন না। ইসলাম কর্তৃক আরোপিত ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন এবং তার শিক্ষায় তিনি এর উপর গুরুত্বারোপ করেন। আমাদের কাছে রক্ষিত 'বালা'র গ্রন্থ 'জনম সখি'র ১৯৩ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, নানক বলেছেন, "হে রুকুনদ্দীন, আমার কাছ থেকে সঠিক জবাব শোন : কেতাবটিতে খোদার কালাম লিপিবদ্ধ আছে। ঐ লোক দোযখে যাবে, যে কলেমা পুনরাবৃত্তি করে না, ত্রিশটি রোযা রাখে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে না, আইন সিদ্ধ নয় এমন জিনিস ভক্ষণ করে। এরাই শাস্তি পাবে এবং তলাহীন গহ্বর হবে তাদের নিবাস"। একথাও বলা হয়েছে যে, বাবা নানক মক্কায় পুরো এক বছর রোযা রেখেছেন এবং আযান দিয়েছেন। এটাও উল্লেখ রয়েছে যে বাবা নানক মহানবী (সা.) এর পবিত্র বাণী আবৃত্তি করে আনন্দবোধ করতেন।

এই অল্প ক'টি উদ্ধৃতিই এ বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য পর্যাপ্ত যে, ইসলামের সত্যতাকে নানক শুধু একনিষ্ঠভাবে স্বীকারই করতেন না, তিনি ইসলামী আইনের বাধ্যবাধকতাকেও মেনে চলতেন এবং অন্যদেরকেও তা অনুসরণ করতে উপদেশ দিতেন। এখন এ প্রশ্ন জাগে যে, নানক কর্তৃক প্রচারিত ধর্মটি কিভাবে হিন্দুমতবাদ থেকে উদ্ভূত বলে চিহ্নিত হলো। শিখ মতবাদের ইতিহাসের সাথে পরিচিত যে কেউ এ উপসংহারে পৌঁছবে যে, কোন ধর্মীয় কারণে নয় বরং স্রেফ রাজনৈতিক কারণেই এ রূপান্তর হয়েছে।

বাবা নানক শুধু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারী এক ব্যক্তিই ছিলেন না। তিনি এটাও অনুভব করেছিলেন যে, তাকে আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে কাজ করতে এবং অনেক মুসলমান সূফীদের পন্থায় লোকদেরকে তার শিষ্যত্বে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এটা পরবর্তী সময়ের ইতিহাসবিদদেরকে এ মন্তব্য করতে পরিচালিত করেছে যে, বাবা নানক এক নতুন ধর্ম-মত প্রতিষ্ঠা করলেন, যা মুসলমান ও হিন্দুদেরকে একতার ভাঁজে আবদ্ধ করে এবং এভাবে শিখ মতবাদ ছিল দু'টি ধর্মের আপোষের ফসল।

এ সিদ্ধান্ত আমাদের বাতিল করতে হবে, কারণ আমাদের জানা মতে নানকের কোন মুসলমান শিষ্যই তার ইসলামী নীতিকে বিশ্বাসকে বিসর্জন দেয়নি অথবা নামায ও

রোযা পালনে কোন ইসলামী বাধা নিষেধের পরিপন্থী কাজ করে নি। নানকের আমলে পাঞ্জাব ইসলামী শাসনের অধীন ছিল এবং নানক যদি কোন মুসলমানকে অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত করতেন, তাহলে ধর্মত্যাগের কারণে মধ্যযুগের সব মুসলমান শাসক কর্তৃক তার মৃত্যু দন্ডের (যদিও এটা সম্পূর্ণ অনৈসলামিক রীতি) শাস্তি কড়াকড়ি ভাবে বলবৎ করা হতো।

কিন্তু নানকের কোন শিষ্য কোনভাবেই কোন প্রকার ক্ষতির শিকারে পরিণত হয়নি এবং কাউকেই পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে দেয়া হয়নি। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সমসাময়িক কালের লোকজন নানককে একজন মুসলিম সূফী বলে মনে করতো। কোন্ কোন্ কারণে শিখ মতবাদকে ইসলামের সাথে অভিন্ন বলে বিবেচনা করা হয়েছে, তা পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু যেসব বিষয় একটি জাতির ধর্মীয় চিন্তাকে গঠন করে সেগুলো সাধারণত এতই সূক্ষ্ম ও পরিবর্তনশীল হয়ে থাকে যে, উহাদের এক পূর্ণ ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব।

যখন কেউ ইতিহাসের গতিপথ বিশ্লেষণ করে, তখন খৃষ্টের একেশ্বরবাদের শিক্ষা পৌলীয় ত্রিত্ববাদে রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি তাকে অনেক বড় এক অসুবিধায় ফেলে দেয়। মূলত: ইহুদীবাদের এক শাখা শীঘ্রই এক আন্দোলনে উন্নীত হয় এবং উহা পূর্ব পুরুষের ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। গুরু নানক যেভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, মুক্তি অর্জন করতে হলে ইসলামী আইনের আদেশ-নিষেধ সমূহ মানতে হবে, যীশুও দৃঢ়ভাবে একথা বলেছেন যে, কোন পরিস্থিতিতেই মূসায়ী আইন পরিবর্তন করা যাবে না। যাহোক, মাত্র এক পুরুষ কালের মধ্যেই তার শিক্ষাসমূহ পরিবর্তন, গুদামে তালাবদ্ধ এবং পিপা বন্দী করা হয়েছিল। বাবা নানক হিন্দু-শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাদেরকে সরাসরি ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বলেন নি। তারা তাদের ঐতিহ্যগত জীবনধারাসহ নিজেদেরকে হিন্দু আখ্যায়িত করতে পারতেন এবং তারপরও বাবা নানকের দলে তাদের অবস্থান জারি রাখতে পারতেন।

এটা বিশ্বাস করার জোরালো কারণ রয়েছে যে, নানকের মৃত্যুতে তার আন্দোলনে মুসলমানের যে অন্ত:প্রবাহ ছিল, তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

নানকের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা-ই মুসলমানদেরকে তার দিকে আকর্ষণ করেছিল এবং তাদের এ বিশ্বাস অর্জন হয়েছিল যে, তিনি ছিলেন একজন মুসলমান দরবেশ। তদানুযায়ী নানকের মৃত্যু ছিল সেই বাঁক, যেখান থেকে মুসলিম উপাদান অদৃশ্য হতে শুরু করলো।

আন্দোলনটি হিন্দু-শিষ্যদের হাতেই রয়ে গেল, যারা সময়ের আবর্তে তাদের পুরনো ধর্মে প্রত্যাবর্তন করলো। রাজনৈতিক অবস্থা এই বিচ্ছিন্নতাকে দ্রুততর করলো। এর সর্বোচ্চ সীমা দশম গুরু, গুরু গোবিন্দ শিংজীর প্রত্যক্ষকরণ থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে খোদার শক্তি 'খাঞ্জা' এক দুই ধার বিশিষ্ট নামক তরবারির প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

পূর্বাহ্নে 'জনম সখিতে' লিখিত মাত্র কয়েকটি শিক্ষা ব্যতীত ৫ম গুরু অর্জন দেব থেকে সামনের দিকের 'গ্রন্থ সাহেব' সহ লিখিত শিখদের সব ধর্মগ্রন্থ থেকে ইসলামী উপাদানসমূহ অদৃশ্য হতে শুরু করে। এভাবে গুরু নানকের মতাদর্শ ও শিক্ষাকে, তার প্রকৃত অবস্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয়া হয়েছে।

[রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স মার্চ, ১৯৯৩ অবলম্বনে]

মুসলেহ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সকল পাঠকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

বের হয়েছে! বের হয়েছে !!

১। মৌলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ সাহেব রচিত 'সাইয়্যেদাতুন নিসা হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)' বইটি সদ্য প্রকাশিত হয়েছে।

২। আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব রচিত 'কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ও কল্কি জগতপতি' বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

৩। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কর্তৃক রচিত অত্যন্ত মূল্যবান বই 'দাফেউল বালা' (বালা মুসিবত প্রতিরোধক) বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে।

সবকটি বই আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি আপনার কপিটি দ্রুত সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা :
আহমদীয়া লাইব্রেরী
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল নং : ০১৭৩৬১২৪৭০৪

بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

HEAD OF AHMADIYYA MUSLIM JAMAAT RESPONDS TO BRUTAL KILLINGS OF AHMADI MUSLIMS IN IN INDONESIA

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad says that perpetrators will be answerable to God Almighty

It is with great sadness that the Ahmadiyya Muslim Jamaat confirms that yesterday on 6th February 2011, 3 members of its community were martyred in Indonesia in an utterly barbaric and brutal attack.

The attack occurred in Cikeusik, south of Banten in Indonesia and was conducted by a large group of people numbering between 700 and 1,000. The attack occurred even though police had been forewarned for a number of days about an imminent attack on the local Ahmadi Muslims. Despite the warnings the police failed to take any measures or steps to prevent the attack.

It is reported that the attackers came to the local centre of the Ahmadiyya Muslim Jamaat brandishing machetes, spears, knives and other weapons. As a result 3 Ahmadi Muslims were martyred publically and 5 others were seriously injured. 2 cars, 1 house and 1 motorcycle belonging to Ahmadi Muslims were also burnt down. Thus far no one has been arrested by the police in relation to this incident.

Speaking from London in response to these brutal killings, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, the Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat said:

"This horrific attack has caused grief and pain to all Ahmadi Muslims worldwide and indeed to all peace loving people. The barbarity of the perpetrators knows no bounds; indeed people watching the merciless beatings were clapping and cheering. The local police and authorities failed to protect the Ahmadi Muslims and allowed them to be exposed to this cruel and brutal attack. Whenever such attacks occur the Ahmadiyya Muslim Jamaat both in Indonesia and worldwide always displays patience and seeks solace not in revenge or violence but through prayers to God Almighty and this will always remain the case. It is however certain that those who have inflicted these cruelties will be answerable to God Almighty and will have to face His punishment. In the meantime the Ahmadiyya Muslim Jamaat will continue to bow down in front of the One God and seek His Protection and Help."

The Ahmadiyya Muslim Jamaat calls on the Indonesian Government to fulfil its mandate to protect all of its citizens, regardless of religion. It is also hereby clarified that no Ahmadi Muslim was involved in any form of provocation whatsoever and that these attacks were motivated simply due to the fact that the victims were members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat. It is a tragedy that these Ahmadi Muslims were martyred in the most barbaric way because they chose to live their lives by the Ahmadiyya motto of 'Love for All, Hatred for None'.

A further Press Release with particulars of the deceased and further details will soon be issued.

End

(Further Info: press@ahmadiyya.org.uk)

بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Ever Merciful

Press Desk

Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

৭ ফেব্রুয়ারী ২০১১

ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ডেস্ক থেকে-

ইন্দোনেশীয়ায় নিরীহ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণকে নির্মমভাবে হত্যা করায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ-এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ও কঠোর হুঁশিয়ারী

"অপরাধীদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে"

আহমদীয়া মুসলিম জামাত অত্যন্ত দু:খের সাথে জানাচ্ছে যে, গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইন্দোনেশিয়ার ৩ জন সদস্যকে বর্বরোচিত ও নির্দয়ভাবে আক্রমণ করে শহীদ করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ বাটেন শহরের সিকিউসিক - এ এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হয় এবং ৭০০ থেকে ১০০০ লোকের একটি দাঙ্গাবাজ দল দ্বারা এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়। স্থানীয় আহমদী মুসলমানদের উপর আক্রমণ হতে পারে মর্মে পুলিশকে বেশ কিছুদিন পূর্বে সতর্ক করে দেয়ার পরও আক্রমণটি সংঘটিত হল। আগাম সতর্ক ব্যবস্থা করার কথা জানানো সত্ত্বেও পুলিশ এর প্রতিকার করতে বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়।

প্রতিবেদনগুলোতে এটা উল্লেখ করা হয় যে, আক্রমণকারীরা স্থানীয় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রে ধারালো ধাতব ফলা, বর্শা, ছোড়া এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ করে। ফলে ঘটনাস্থলে ৩ জন আহমদী মুসলমান শহীদ হন এবং ৫ জন মারাত্মক ভাবে আহত হয়। আহমদীদের ২ টি কার, ১ টি বাড়ি ও ১ টি মটর সাইকেল পুড়িয়ে দেয়া হয়। তথাপি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে পুলিশ এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি।

এই পাশবিক হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে লন্ডন থেকে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর বর্তমান খলীফা বলেন, **"এই ভয়ংকর আক্রমণ বিশ্বের সমস্ত আহমদী মুসলমান ও শান্তি প্রিয় মানুষদেরকে গভীরভাবে মর্মাহত ও ব্যথিত করেছে। দুস্কৃতকারিদের পাশবিকতার সীমা ছিল না, বরং দর্শনার্থী লোকজনও এই নির্দয় আক্রমণ দেখে করতালি দিচ্ছিল ও আনন্দ প্রকাশ করছিল (এ-এক পৈশাচিক উল্লাস!)। স্থানীয় পুলিশ এবং কর্তৃপক্ষ আহমদী মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে কেবল ব্যর্থই হয়নি বরং হামলাকারীদেরকে এই নিষ্ঠুর ও পাশবিক আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে।**

যখনই এমন আক্রমণ সংঘটিত হয়, হোক তা ইন্দোনেশিয়ায় কিম্বা বিশ্বের অন্যত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত সর্বদা ধৈর্য্যের সাথে এর মোকাবেলা করেছে এবং সান্তনা খুঁজেছে প্রতিশোধ বা আন্দোলনের মাধ্যমে নয় বরং সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার মাধ্যমে এবং সর্বদা এমনটি-ই হবে। যাই হোক এটা নিশ্চিত যে, এই নিষ্ঠুরতার সাথে জড়িত সকলকে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে এবং তার শাস্তি তাদেরকে চেখে নিতে হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সর্বদা এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে যেতেই থাকবে এবং তাঁরই নিকট নিরাপত্তা ও সাহায্য যাচনা করবে।"

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইন্দোনেশিয়া সরকারকে ধর্মীয় কুপমন্ডুকতার উর্দ্ধে উঠে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণ করার জন্য আহবান জানাচ্ছে। এখানে স্পষ্টভাবে এটা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, কোন আহমদী-ই উত্তেজনাকর কোন ঘটনার সাথে জড়িত ছিলনা এবং এই আক্রমণ কেবলমাত্র এ কারণে সংঘটিত হয় যে, এই নিপীড়িতরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য। এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক বিষয়, আহমদী মুসলিমদেরকে সবচেয়ে বর্বরোচিত পদ্ধতিতে এজন্য শহীদ করা হলো কারন তারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের **"ভালো বাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো 'পরে"** এই অমোঘ শিক্ষা সারথী করে জীবন ধারনের পথ বেছে নিয়েছে।

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ এলাহী আলামীন (সবুজ)**

মুসলেহ মাওউদ দিবস ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মাহমুদ আহমদ সুমন

ধন্য হে রাসূল (সা.)
ধন্য তোমার পবিত্র বাণী
ধন্য হে মসীহ্ মাহদী (আ.)
ধন্য তোমার ইলহাম।

ধন্য মাহদীপুত্র মাহমুদ (রা.)
তুমিই যে প্রতিশ্রুত সেই সন্তান
তুমিই যে মুসলেহ্ মাওউদ।

২০ ফেব্রুয়ারী আমাদের মাঝে উপস্থিত এর মধ্যে কেটে গেছে ১২৫টি বছর। শুধু আহমদীয়াতের ইতিহাসেই নয় বরং ইসলামের ইতিহাসেও ২০ ফেব্রুয়ারীর দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত রসূলে করীম (সা.) আজ থেকে পনেরশত বছর পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন "শেষ যুগে মসীহ্ মাওউদ আগমন করবেন এবং বিবাহ করবেন ও সন্তান লাভ করবেন"। আমরা সবাই জানি, সন্তান লাভ করা একটা সাধারণ ব্যাপার।

তবে এখানে শেষ যুগের মসীহর যে সন্তানের কথা বলা হয়েছে তা এই হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ দিকেই ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সন্তান অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হবেন। পৃথিবীতে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আগমন হয়, যাদের আগমন বার্তা আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্মের পুর্বেই জগদ্বাসীকে জানিয়ে দেন। এমন-ই এক ক্ষণজন্মা মহান সত্তা ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মুসলেহ মাওউদ মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা ইলহাম করেন–**"তেরি উকদাকুশাই হুশিয়ারপুর মে হোগী"**। সে অনুযায়ী তিনি (আ.) হুশিয়ারপুর যান। সেখানে ৪০ দিন নিরবে নিভৃতে দোয়া করেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এক মহান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন। ১৮৮৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী এক প্রচার লিপিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) 'সবুজ ইশতেহার'-এর মাধ্যমে জগদ্বাসীকে তা জানিয়ে দেন। সেই প্রচার লিপিতে তাঁর জন্ম, ব্যক্তিত্ব, কর্মময় জীবন কেমন হবে তা-ও জানিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয় "সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। তবে সঙ্গে ফযলের আবির্ভাব হবে, সে পৃথিবীতে এসে তার সঞ্জীবনী শক্তি পবিত্র আত্মা দ্বারা বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে"। আরো বলা হয় "সে অত্যন্ত ধর্মীয় প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে"।

ইলহাম মতাবেক যথা সময়ে প্রতিশ্রুত এ সন্তানের জন্ম হলো। নাম রাখা হলো মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ। জগত দেখেছে, কিভাবে তাঁর মাঝে মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সত্যতা প্রকাশ হয়েছে। জগদ্বাসী এটাও দেখেছে কিভাবে সেই প্রচার লিপির সব প্রতিশ্রুতি তাঁর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯১৪ সালে তিনি জামা'তে আহমদীয়ার ২য় খলীফা নির্বাচিত হন।

দীর্ঘ ৫২ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে এক নিঃস্ব, দূর্বল, ছোট, অসহায় অর্থ সম্পদহীন জামা'তকে এক মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গেছেন। জামা'তকে উপমহাদেশের গন্ডি থেকে বের করে বহির্বিশ্বের কোণায় কোণায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় ৪৬টি দেশে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দীর্ঘ ৪০ দিন হুশিয়ারপুরে নীরবে নিভৃতে দোয়া করেন তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। কারণ তিনি সত্য মাহদী, আর সত্য মাহদীর সত্যতা প্রকাশ স্বরূপ এমন অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী সন্তান লাভ করা তাঁর সত্যতার একটি নিদর্শন ছিলো। দোয়া কবুল করে আল্লাহ্ তাআলা মুসলেহ্ মাওউদ সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে ঐশী বাণী মারফত জানান "আমি তোমার প্রার্থনানুযায়ী তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার ক্রন্দন শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে অনুগ্রহ করে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছ। হে বিজয়ী তোমার প্রতি সালাম।

খোদা বলেছেন, যারা জীবন প্রত্যাশী তারা যেন মৃত্যুর কবল হতে মুক্তি লাভ করে এবং যারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তারা বের হয়ে আসে যাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্ তাআলার কালামের মর্যাদা লোকের কাছে প্রকাশিত হয় এবং সত্য তার যাবতীয় আশীষ সহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ণ করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান, যা ইচ্ছা করি করে থাকি এবং যেন তাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কিতাব তাঁর রাসূল পাক মুহাম্মদ মুস্তফাকে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করে থাকে তারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়। সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হলো। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত সন্তান হবে।"

তাঁর সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি এবং 'পবিত্র আত্মার' প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে **'কালেমাতুল্লাহ্'**-আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ

করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে, (এর অর্থ বুঝি নাই) সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ প্রিয় পুত্র।

"মাযহারুল আওওয়ালে ওয়াল আখেরে মাযহারুল হাক্কে ওয়াল-উ'লা কাআন্‌নাল্লাহা নাযালা মিনাস সামা।"

অর্থাৎ, সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ্ আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার আগমন অশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতি আসতেছে, জ্যোতি। খোদা তাকে তাঁর সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকে দিব এবং খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে।

সে শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিগণ তার নিকট হতে আশিস লাভ করবে। তখন তার আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে। ওয়া কানা আমরা মকযিয়া (অর্থাৎ এটাই আল্লাহ্‌র আসল মীমাংসা)। (ইশতেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ সন সৌজন্য ঃ পাক্ষিক আহমদী-১৯৬৩)

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ-ও ঘোষণা করেন, উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণ সম্পন্ন মহান পুত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্মলাভ করবে। সুতরাং এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে শুভ সোমবার প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন।

তাঁর পবিত্র নাম ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশতেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনযায়ী বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ রাখা হয়। তাঁর জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইলহাম মারফত অবগত হয়ে নির্দিষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে ইহা প্রকাশ করেন, মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই। তিনি ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর ৫২ বছর ব্যাপী সুদীর্ঘ খেলাফতকালীন বিপুল ঘটনাবলী প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি বাক্য তাঁর মাঝে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তিনি নিজেই আল্লাহ্ তাআলার নিকট হতে ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুসলেহ্ মাওউদ হবার দাবী করেন।

এই অসাধারণ গুণধর পুত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লাভ করবেন তা তিনি জগদ্বাসীকে জানিয়ে দেন যে, ১৮৮৬ সন হতে ৯ বছরের মধ্যে সেই পুত্রের জন্ম হবে। ৯ বছরের মেয়াদ নির্দ্ধারণ একটা অসাধারণ ব্যাপার। কেননা এই ৯ বছর মেয়াদ নির্দ্ধারণ করা তিনি নিজের ও তাঁর বিবির জীবিত থাকার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। খোদা তাআলার পক্ষ থেকে এত বড় কথা বলা সম্ভব? এই ৯ বছর নিজেরা হয়তো জীবিত থাকলেন, কিন্তু সন্তানাদি লাভ তো না-ও হতে পারে।

আর যদি সন্তান হয় তাতো পুত্র সন্তান নাও হতে পারে। বা পুত্র সন্তান হলোই কিন্তু সেই পুত্র এতগুলি গুণের অধিকারী যে হবে এটা কিভাবে বলা যেতে পারে? অতএব এতগুলি সংশয় ভেদ করে যদি সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়, তা হলে অবশ্যই বলার আর কোন অপেক্ষা রাখে না যে তিনিই সত্য মাহদী। আবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর প্রকাশ হওয়া এবং অসাধারণ গুণধর হওয়া এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার বড় একটা প্রমাণও বহণ করে।

আপনারা সবাই জানেন, আহমদীয়া জামা'তের ওপর শুরু থেকেই চরম বিরোধিতা হয়ে আসছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সময় চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও, এমনকি আততায়ীর গুরুতর আঘাত সত্ত্বেও তিনি ৭৬ বছর জীবিত ছিলেন। আর এই দীর্ঘ জীবন কোন সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় জীবন ছিলো না, তাঁর জীবন ছিলো অসাধারণ যা কেবল মাত্র আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ কৃপার ফলেই লাভ করা সম্ভব। তিনি একাধারে দীর্ঘ ৫২ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ব্যক্তিগত ও খিলাফত জীবনে তাঁরমত দৃঢ়চিত্ত ও উৎসাহী ব্যক্তিকে একমাত্র হযরত ওমরের (রা.) সাথে তুলনা করা যায়।

তাই তো ইলহামের মাধ্যমে তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁকে 'ফজলে ওমর' নাম দেওয়া হয়েছিল। ইসলামের প্রথম যুগের দ্বিতীয় খলীফা ও শেষ যুগের দ্বিতীয় খলীফার সাথে কি আশ্চর্যই না মিল ছিল।

হযরত মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ রয়েছে যে, **"জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁকে পরিপূর্ণ করা হবে।"** তাঁর জীবদ্দশায় অমূল্য কুরআনের তফসীর গ্রন্থ ও বহু পুস্তক পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে ইসলামের মহান সেবার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত বাক্যাবলী পূর্ণতা লাভ করেছে। ১৯০৬ সনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে 'তাশহিযুল আযহান' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকায় তিনি নিজে সম্পাদক হন। ১৯১৩ সালে সাপ্তাহিক আল ফযল প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সনে কুরআনের প্রথম পারা উর্দু ও ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। সুবিখ্যাত তফসীরে কবীরসহ শত শত পুস্তক-পুস্তিকা এবং অনেক খুতবা, বক্তৃতা, ভাষণ প্রকাশিত হয়।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) শুধু মাত্র কুরআনের তফসীর গ্রন্থ 'তফসীরে কবীর' ও 'তফসীরে সগীর' রচনা করে ইসলামের সেবায় যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা-ই তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজে ঘোষণা করেছেন, আমাকে খোদা তাআলা স্বয়ং কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন আর আমি ব্যতিত দুনিয়াতে আর কাউকেই খোদা তাআলা কুরআনের জ্ঞান দান করেন নি।

আর আমি সমস্ত দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি, কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা বর্ণনায় কেউ আমার মোকাবেলা করুক। কুরআনের তফসীর ছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য কিছু পুস্তক হচ্ছে ঃ ১। যিকরে ইলাহী ২। ইরফানে ইলাহী ৩। তকদীরে বিল্লাহ ৪। নবীওঁকা সরদার ৫। মালায়েকাতুল্লাহ্ ৬। নাজাত ৭। মিনহাজুত তালেবীন ৮। দুনিয়াকা মুহসীন, ৯। Introduction to the study of the Holy Quran ১০। Ahmad the messanger of the lattery days ১১। Invitation to Ahmadiyyat ১২। what is Ahmadiyyat? ১৩। The new world order of Islam.

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯১৪ সনে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে খিলাফতে আসীন হয়ে বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারক প্রেরণ করতে থাকেন। হযরত মসীহ মাওউদ (রা.)-এর উপর অবতীর্ণ একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল **"ম্যায়**

তেরে তবলীগকো দুনিয়াকে কিনারো তক পহচাউঙ্গা”

অর্থাৎ আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগান্তকারী পদক্ষেপ সমূহের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

এক এক করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি মোবাল্লেগ প্রেরণ করতে থাকেন। আজ আমরা সেই বীজগুলোকে বিশাল বিশাল বৃক্ষরূপে দেখছি।

আমরা নিঃসন্দেহে এটা বলতে পারি, সকল দিক থেকেই, বিশেষভাবে খোদা তাআলার প্রেম ও আকর্ষণের দিক থেকে তিনি তাঁর পিতার প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

তিনি বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান ভাবে ইসলাম প্রচার কেন্দ্রসমূহ ও বিপুল সংখ্যক উন্নতিশীল জামা'ত এবং তাঁর লিখিত কুরআন শরীফের তুলনাহীন অমূল্য তফসীর (তফসীরে কবীর ও তফসীরে সগীর) জ্ঞান ও তত্ত্ব পূর্ণ অসংখ্য পুস্তক, খুতবা ও বক্তৃতা এবং তাঁর দ্বারা জামা'ত ও নেযামে খিলাফতের দৃঢ়ভিত্তির প্রতিষ্ঠা জীবন্ত খোদার জীবন্ত নিদর্শনরূপে চির অম্লান ও সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তথা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক খোদার বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়েছেন যার ফলে ত্রিত্ববাদের বহু দেশ এবং জাতির লোকেরা প্রকৃত এক খোদার সন্ধান লাভ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। লাখ লাখ পথহারা মানুষ সঠিক পথ খুঁজে পায়।

বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার মুবাল্লেগ আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনাকে তিনি স্বার্থক করেন। তাঁর নেতৃত্বে বলা চলে ইসলামের জয়যাত্রার নব-সূচনা সংগঠিত হয়।

পৃথিবী ব্যাপী ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা তৈরী করা এবং তা কার্যকরী করা আর জামা'তকে নিঃস্ব দূর্বল, ছোট, অসহায় অর্থসম্পদ হীন অবস্থা থেকে এক মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করে গেছেন তিনি। এছাড়া জামাতকে বিরোধী দলের কবল থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি কাজ তাঁর অপরিসীম বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। আর পার্থিব দিক থেকেও তাঁর জীবদ্দশায় বহু জাতি পরাধীনতার বন্দী শিবির হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাও ছিল অতুলনীয়।

তিনি ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতায়ও অবদান রেখেছেন। আর ইহুদী খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ফিলিস্তিন ও মুসলিম বিশ্বকে সতর্ক করেছেন।

ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) যে অবদান রেখে গেছেন তার সামান্য পরিমাণ বর্ণনা করাও এ অধমের পক্ষে সম্ভব নয়।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিক নির্দেশনানুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

শুভ বিবাহ

গত ০৯/০৪/২০১০ইং মোসাঃ শিউলী আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ সেলিম রেজা, গ্রামঃ শরিষাবাড়ী, পোঃ জিউপাড়া, থানা-পুটিয়া, জেলা-নাটোর এর সাথে মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম (শুভ), পিতা-আব্দুর রহমান গ্রাম : তেবাড়ীয়া, পোঃ+জেলা নাটোর এর বিবাহ ৫০,০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮৭৩/১০

গত ২২/১১/২০১০ইং মোসাঃ হাবিবা খাতুন, পিতা-মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, সাং উত্তর বাটনা, পোঃ খড়িবাড়ি, থানা+জেলা ঠাকুরগাঁও এর সাথে মোহাম্মদ শাহিনুর আলম বাদল, পিতা-মোহাম্মদ সহিদুর রহমান গ্রামঃ শালসিড়ি, পোঃ ফুলতলা, থানা-বোদা, জেলা পঞ্চগড় এর বিবাহ ৬০,০০১/- (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮৭৪/১০

গত ১১/০৯/২০১০ইং মোসাঃ ছোগড়া বেগম (টুনী), পিতা মৃত- আজগর আলী খাঁন, পশ্চিম পাইকপড়া, বি, বাড়ীয়া এর সাথে মোহাম্মদ জুয়েল আহমদ ভূঁইয়া, পিতা-মোহাম্মদ ফজল আহমদ ভুঁইয়া, শিমরাইল কান্দি, বি, বাড়ীয়া এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮৭৫/১০

গত ১৯/১১/২০১০ইং মোসাঃ নাছিমা খানম, পিতা মৃত-আমীন খান, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, শালগাঁও, বি, বাড়ীয়া এর বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮৭৬/১০

গত ১৭/০৯/২০১০ইং মোসাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস (মায়া) পিতা-মোহাম্মদ রহমত আলী, সিমরাইল কান্দি, বি, বাড়ীয় এর সাথে মোহাম্মদ রুবায়েত হোসেন উজ্জল, পিতা মৃত-জিল্লুর হোসেন, সাং সিমরাইল কান্দি, বি, বাড়ীয়া এর বিবাহ ২,৫১,০০১/- (দুই লক্ষ একান্ন হাজার এক) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮৭৭/১০

গত ২১/১১/২০১০ইং মোসাঃ শাহীন সুলতানা (শিল্পী) পিতা-মোহাম্মদ আব্দুস ছালাম, গ্রাম–পোঃ মসুরা, থানা-কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ এর সাথে মোহাম্মদ ইয়ার খান, পিতা-মোহাম্মদ মতি মিয়া, গ্রাম- কালি সীমা এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৮৭৮/১০

হযরত শুয়াইব (আ.)-এর ধর্ম প্রচার

মিদিয়ান ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর কৃতদাসী তৃতীয় স্ত্রী কতুরার গর্ভজাত পুত্র। কৃতদাসী পত্নী ছিল বলে কতুরার গর্ভজাত হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সন্তানদেরকে ইসরাঈলীরা এবং ইসমাঈলীরা উভয়েই অবজ্ঞার চোখে দেখত। দুর্বল এবং ঘৃণ্যরূপে তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হতো 'কিন্তু আল্লাহ্ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন এবং তাদেরকে সম্পদ ও শক্তিদান করলেন।

তখন তারা হেজায্ এর উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। আরবের উপকূলবর্তী সিনাই-এর অপর দিকে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এক শহরের নামও মিদিয়ান ছিল। শহরটি এই নামে পরিচিত হওয়ার কারণ এটাই ছিল যে, 'এর অধিবাসীরা মিদিয়ানের পরবর্তী বংশধর ছিল। তাদের রাজধানীকেও মিদিয়ান বলা হতো এবং তারাই এই শহরের নির্মাতা। সাগর কুলের নিকটতম হওয়ার কারণে কেউ কেউ এটাকে সমুদ্র বন্দর বলে উল্লেখ করেছে।

এই শহর আরব উপকূলবর্তী ছয় মাইল দুরত্বে আকাবা উপসাগর হতে এর দুরত্ব আট মাইল। অন্যরা কেউ কেউ একে অভ্যন্তরস্থ শহর বলেছে। হযরত শুয়াইব (আ.) নিজ জন্মভূমি ছেড়ে মিদিয়ানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে ছিলেন; এর জন্যই তাকে মিদিয়ানের ভাই বলা হতো। এই স্থানেই ফেরাউনের যুলুমের কারণে হিজরতের পর বনী ইসরাঈলী নবী হযরত মূসা (আ.) আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং শুয়াইব (আ.)-এর এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। হযরত শুয়াইব (আ.) হযরত মূসা (আ.) এর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জাতি ব্যবসায় লেন-দেনে অসাধু ছিল।

তখন আল্লাহ্ মিদিয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা হযরত শুয়াইব (আ.)কে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মা'বুদ নাই। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, 'এবং আমার আনুগত্য কর।

নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় দেখছি সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচারের সাথে মাপ এবং ওজন পুরা দাও এবং লোকদেরকে তাদের জিনিসপত্র কম দিও না এবং পৃথিবীতে এর সংশোধনের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না এবং পরকালের প্রতি মনোযোগী হও, 'এটা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্টতর, 'যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক, 'এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি। যদি তোমরা মু'মিন হও তাহলে নিশ্চয় জেনে রাখ যে, 'আল্লাহ্ যা অবশিষ্ট রাখেন তা-ই তোমাদের জন্য উত্তম এবং আমি তোমাদের উপর রক্ষাকারী নিযুক্ত নই।

তারা বললো, 'হে শুয়াইব! তোমার ইবাদত বন্দেগী কি তোমাকে এই আদেশ দেয় যে, 'আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার উপাসনা করে এসেছে আমরা তাকে পরিত্যাগ করি অথবা আমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা আমরা যা করতে চাই তাকে পরিত্যাগ করি? তুমি তো দেখছি বড় বুদ্ধিমান ন্যায়বিচারক!

তিনি বললেন, 'হে আমার অরণ্যের অধিবাসীগণ! তোমরা চিন্তা করে বল, 'যদি আমি আমার প্রভুর দেওয়া কোন উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, 'এবং তিনি আমাদেরকে নিজ সন্নিধান হতে উত্তম রিয্‌ক দিয়ে থাকেন, তাহলে তোমরা তাঁকে কি জবাব দিবে? এবং আমি এটা চাই না যে, 'আমি যে বিষয় হতে তোমাদেরকে নিবৃত্ত করি সেই বিষয়ে নিজে লিপ্ত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করি।

আমি আমার সাধ্যানুযায়ী কেবল সংশোধন কামনা করি 'এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতিরেকে আমার কোন সামর্থ্য নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই নিকট আমি অবনত হই এবং তোমরা রাস্তায় রাস্তায় এই উদ্দেশ্যে বসে থেকো না যাতে তোমরা তাদেরকে ভয় দেখাও এবং আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত রাখ যারা তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাকে বক্র করার চেষ্টা কর এবং স্মরণ কর যখন তোমরা স্বল্প ছিলে, 'অত:পর তোমাদেরকে অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি করলেন এবং লক্ষ্য কর, 'বিশৃঙ্খলাকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল! এবং তোমাদের মধ্য হতে যদি কোন দল এরূপ থাকে, 'যারা এর উপর ঈমান এনেছে, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং কোন দল এমন থাকে যারা ঈমান আনে নাই, 'তাহলে ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন এবং তিনিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

তার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যারা অহংকার করত, 'তারা বললো, 'হে শুয়াইব! অবশ্যই আমরা তোমাকে এবং ঐ সকল লোককে যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে, আমাদের শহর হতে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।'

তিনি বললেন, 'যদি আমরা অপসন্দ করি, তবুও কি? যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, 'এরপরও যে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে তা হতে উদ্ধার করেন, তাহলে এর অর্থ হবে যে, 'আমরা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করেছিলাম এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত এতে ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, 'আমাদের প্রভু সকল বস্তুকে

জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ্‌র উপর আমরা নির্ভর করি। হে আমার জাতি! আমার সাথে বিরুদ্ধাচরণ যেন, তোমাদেরকে কিছুতেই এমন অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে, 'যার ফলে তোমাদের উপর ঐরূপ দুর্যোগ ও মসিবত আসে যেরূপ নূহের জাতি, অথবা হুদের জাতি কিংবা সালেহ্‌র জাতির উপর এসেছিল, আর লুতের জাতিতো তোমাদের নিকট হতে দূরে নয় এবং তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, 'অত:পর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয় আমার প্রভু পরম দয়াময়, পরম প্রেমময়।'

তারা বললো, হে শুয়াইব! তুমি যা বলছ তা অধিকাংশই আমরা বুঝছি না 'এবং আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল মনে করি এবং যদি তোমার গোত্র না থাকত তাহলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। তুমি আমাদের উপর শাক্তিশালী নও। তিনি বললেন, হে আমার জাতি! তোমাদের দৃষ্টিতে আমার গোত্র কি আল্লাহর তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী? এবং তোমরা তাকে উপেক্ষার বস্তু হিসেবে তোমাদের পিছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় আমার প্রভু তোমরা যা কিছু কর তাকে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং আমি তোমাদের নিকট এর কোন প্রতিদান চাই না।

আমার প্রতিদান একমাত্র সমগ্র জগতের প্রতিপালকের নিকট আছে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূববর্তী সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন, তোমরা তার তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। তারা বললো, 'নিশ্চয় তোমরা যাদু গ্রস্তদের অন্তর্গত, তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বই কিছু নও, 'এবং আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি, অতএব, 'তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও।'

তিনি বললেন, আমার প্রভু তোমাদের কার্যকলাপ ভালভাবে জানেন। 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে যথাযথভাবে মীমাংসা করে দাও, 'কেননা তুমি উত্তম মীমাংসাকারী।
তখন তার জাতির প্রধান ব্যক্তিবর্গ যারা অস্বীকার করেছিল 'তারা বললো, 'যদি তোমরা শুয়াইবকে অনুসরণ কর, তাহলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

আল্লাহ্‌ কখনো এমন কোন জনপদে কোন নবী পাঠায় নি–কিন্তু তিনি এর অধিবাসীদেরকে অভাব অনটন ও দু:খ ক্লেশ দ্বারা ধৃত করেছেন, 'যেন তারা বিনয়াবনত হয়। তিনি তাদের মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলিয়ে ছিলেন যে পর্যন্ত না তারা ধন-জন বাড়িয়ে গিয়েছিল, তখন তারা বলতে লাগল, 'আমাদের পিতৃপুরুষদের উপর দু:খ ও সুখ আসতো আমাদের জন্য এটা নতুন নয়।

অতএব অকস্মাৎ আল্লাহ্‌ তাদেরকে এমতাবস্থায় ধৃত করলেন যে তারা বুঝতেও পারেনি এবং যদি সেই সকল শহরের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করত তাহলে আল্লাহ্‌ নিশ্চয় তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ার খুলে দিতেন, 'কিন্তু তারা নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করল, 'সুতরাং তারা যা অর্জন করে আসছিল এর জন্য আল্লাহ্‌ তাদেরকে ধৃত করলেন।

হযরত শুয়াইব (আ.)-এর জাতির উপর ভূমিকম্প :

হযরত শুয়াইব (আ.) বললেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা নিজেদের জায়গায় নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে থাক, 'আমিও কাজ করে যাচ্ছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আযাব আসে যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে এবং কে মিথ্যাবাদী এবং তোমরা অপেক্ষা কর, 'নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে পরিণামের জন্য অপেক্ষা করছি।

যখন আল্লাহ্‌র আযাবের হুকুম আসল, 'তখন তিনি হযরত শুয়াইব (আ.) এবং যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল তাদেরকে তাঁদের বিশেষ রহমতে রক্ষা করেছিলেন এবং যারা যুলুম করেছিল তাদেরকে এক বিকট শব্দ বিশিষ্ট ভূমিকম্প এসে তাদেরকে ধৃত করল ফলে তারা স্বস্বগৃহে উপর হয়ে পড়ে থাকল। 'যেন তারা এতে কখনও বসবাস করেনি। শুন, 'মিদিয়ানবাসী সেভাবে ধ্বংস হল যেভাবে সামুদ জাতি ধ্বংস হয়েছে।

তখন হযরত শুয়াইব (আ.) অত্যন্ত মর্মবিদারক হয়ে প্রত্যেক সত্য নবীর মতই তাঁর জাতির জন্য তীব্র শোক ও কঠিন মর্মপীড়া অনুভব করে তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'হে আমার জাতি! অবশ্যই আমি তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়েছিলাম। অতএব এখন আমি কিরূপে কাফের জাতির জন্য দু:খ করবো।'
নিশ্চয় এতে বড় নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্‌ মহাপরাক্রমশালী ও পরম দয়াময়।

(তথ্য : আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা কুরআন মজীদ অবলম্বনে)

সংকলন : **মৌ. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন**

কৃতি ছাত্রী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেজগাঁও-এর সেক্রেটারী ফাইনান্স জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম সাহেবের ২য় মেয়ে মুনতাহা ফারিন এবছর ভিকারুন নিসানূন স্কুল থেকে জে, এস, সি পরীক্ষায় জি, পি, এ-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

সে তেজগাঁও জামাতের সাবেক প্রেসীডেন্ট জনাব ডা. এম. এ. রশীদ সাহেবের ছেলের ঘরের নাতনী। মুনতাহা ফারিন জামাতের সকলের কাছে তার ধারাবাহিক উচ্চ শিক্ষা ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য দোয়াপ্রার্থী।

দোয়াপ্রার্থী
মাতা-সৈয়দা ফারহানা আহমেদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,
তেজগাঁও

শিক্ষার অন্তরালে ভেজালের হাটবাজার

সরফরাজ এম.এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড বলা হয়। শিক্ষায় যে জাতি যত উন্নত, পৃথিবীতে সেই জাতি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, মানে সম্মানে ধন-সম্পদে, সাহসে শক্তিতে উন্নতি লাভ করতে বিশ্বের বুকে প্রভুত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে সমর্থ হয়েছে। অতীত মুসলমান জাতির গৌরবময় ইতিহাস একথার সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করছে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে উন্নত চরিত্র গঠনে ও মন মানষিকতায় প্রস্তুত করা। ন্যায় পরায়ণের সাথে বিবেকের কষ্টি পাথরে সত্য মিথ্যা ভালো মন্দ যাচাই বাছাই করে যা সত্য বা ভালো তাকে গ্রহণ করা এবং যা মিথ্যা বা মন্দ তা প্রত্যাখ্যান করা।

এ কারণেই মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তাছাড়া সৃষ্টির দিক থেকে মানুষ আর চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের মধ্যে কোন তফাত নেই। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের উন্নত মানবাধিকার প্রস্তুত করত একীনে, ঈমানে, বিশ্বাসে সুদৃঢ় করে সৎপথে চলার এবং সত্য কথা বলায় অটল থাকার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। ইসলামের আদর্শ শিক্ষার আলোকে যদি মানব জীবনকে গড়ে তোলা যায় তা হলে সমাজের বুকে কখনো মিথ্যা, অন্যায়-অবিচার এবং অপরাধমূলক কোন কাজ সংগঠিত হতে পারে না।

মানুষ যদি ইসলামের আদর্শ শিক্ষায় মজবুত ঈমানে বলিয়ান হয় তাহলেই তার চিন্তাশক্তি এবং ধ্যান ধারণাকে সত্য ও সঠিক পথে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। একটা মিথ্যা অনুষ্ঠান করতে করতে সমাজে তা সংক্রামক ব্যধিরূপে প্রকাশ পেয়ে পরিশেষে সেই মিথ্যা বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানই মহাপুণ্যের কাজ বলে মানব মনে মজ্জাগত বিশ্বাসে পরিনত হয়। যেমন, মিলাদ মাহফিল একটি। এইরূপ মিথ্যা ও ভেজাল শিক্ষার কারণেই মানুষ আজ নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজে জড়িত হয়ে অধপতনের চরম সীমায় এসে ঠেকেছে।

পীর পূজা, কবর পূজা এমনকি তারা পীরদেরকে মুক্তিদাতা প্রভু বলে মান্য করতে দ্বীধাবোধ করে না এবং অনেকেই তাদের পদপ্রান্তে লুন্ঠিত হয়ে নাজাত প্রার্থনা করে। আর পীর সাহেবগণ ধর্মীয় লাভজনক ব্যবসার ফাঁদ পেতে আয় রোজগার করত: ভোগ বিলাসে আরাম আয়েশে জীবন যাপন করছে। তারা তাদের শিষ্যগণকে এমনি সব বিষয়াবলী শিক্ষা দিয়ে থাকেন যেগুলি নতুন নতুন এক একটা শরিয়ত বলে মনে হয়। ইসলামে রাজা বাদশাহর কোন স্থান না থাকলেও পীর মোহদয়গণ ধর্মীয় রাজা বাদশাহ সেজে বংশানুক্রমে তাদের পীরালি চলাচ্ছে।

এইরূপ শিক্ষার নামে পাঠ্য পুস্তকেও লক্ষ্য করা যায় মিথ্যা ও ভেজাল শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যেগুলি কিনা পবিত্র কুরআন ও হযরত রাসূল করীম (সা.) এর আদর্শ শিক্ষার পরিপন্থী। যেমন সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শিক্ষা একাডেমী অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত ইসলাম শিক্ষা নামক পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত ঈসা (আ.) কে মৃতকে জীবিত করা জন্মান্ধকে চক্ষু দান করা, শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করার শক্তিদান করেছিলেন। হযরত ঈসা (আ.) ইহুদীদের দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রের বিরুদ্ধে কথা বলায় তারা ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে সর্বপ্রকার কষ্ট দেয়।

এ হীন উদ্দেশ্যে তারা তাঁর ঘর অবরোধ করে এবং 'তাউতালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে সর্বপ্রথম তাঁকে হত্যা করার জন্য পাঠায়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আগেই তাঁকে জীবিতাবস্থায় আসমানে তুলে নেন। তাউতালানুস ঈসা (আ.) এর নাগাল তো পেলই না বরং ইতিমধ্যে তার চেহারা হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুরূপ হয়ে গেল। উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়ে যখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন অন্যান্য ইহুদীরা তাকে ঈসা মনে করে পাকড়াও করল এবং শুলে বিদ্ধ করে হত্যা করল।

এ মর্মে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করলেন, "তাহারা তাঁকে (হযরত ঈসকে) হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি বরং তারা এরূপ এক বাধায় পতিত হয়েছিল যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংযুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি বরং তাঁকে তার কাছে তুলে নিয়েছেন আল্লাহ্ পাক মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা : ১৫৭-১৫৮)।

উপরোক্ত 'ইসলাম শিক্ষা' নামক পুস্তকে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেষ যামানায় কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ.) পুণরায় দুনিয়ায় আগমন করবেন। এ সময় তিনি ৪৫ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। মিথ্যা আল্লাহ্ দাবীদার দাজ্জালকে হত্যা করবেন, জিযিয়া প্রথা তুলে দিবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর মেরে ফেলবেন, আল্লাহ্ পাকের বিধি-বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করে দুনিয়াতে ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। এ সময় মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা এ পর্যায়ে পৌঁছবে যে, সাহায্য নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঈসা (আ.)-এর সময় মহানবী (সা.) এর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর দীন প্রচার করবেন। এরপর তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন এবং নবী করীম (সা.) এর রওযা মুবারকে সমাহিত হবেন।"

পাক কালামে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যারা ইহজগতে অন্ধ থাকবে পরজগতেও তারা অন্ধ থাকবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল) এ কথার মানে এই নয় যে মাতৃগর্ভ থেকে যারা চক্ষুহীন অবস্থায় জন্ম লাভ করবে তারাই পরজগতে অন্ধ থাকবে। বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞানচক্ষু যাদের অন্ধ তারাই পরজগতে অন্ধ থাকবে। "বাহ্যিক চর্মচক্ষু অন্ধ নয় পরন্তু হৃদয়চক্ষু অন্ধ যা বক্ষে আছে।" (সূরা আল হাজ্জ)

এইরূপ অন্ধত্বের কারণেই বিশ্বনবী জগৎগুরু মানবমুকুট হযরত নবী করীম (সা.)-কে মদীনার মাটির নীচে শুয়ায়ে রেখে খৃষ্টানদের নবী ঈসা (আ.) কে স্বশরীরে আসমানে তুলে রেখেছে। "তারা বুঝে না, এই জন্য নিশ্চয়ই আমরা তাদের দীলের উপর পর্দা দিয়েছি এবং বধির করে দিয়েছি।" (সূরা কাহাফ)

যাঁর জন্যে আল্লাহ্ তাআলা আসমান জমিন এবং এতোদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তদসমুদয় সৃষ্টি করেছেন, সেই রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, এমতাবস্থায় আকাশে বা পাতালে আর কেউই বেঁচে নেই এবং বেঁচে থাকতেও পারে না। এইরূপ বিশ্বাস রাখাই একজন খাঁটি ঈমানদার মুসলমানের পরিচয়। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)।

তিনি বলে গেছেন যে, আমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূল এবং কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস

রেখো। তাই তো আমরা বিশ্বাস করি যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন নবী ছিলেন নতুবা ঈসা (আ.) আমাদের কে? "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব সেই সকল বোবা বধিরগণ যারা বুদ্ধি বিবেচনা করে না।" (সূরা আনআম) যাদের অন্তর থেকে সত্য মিথ্যা পার্থক্য বিচার ন্যায় পরায়ণতা লোপ পেয়ে গেছে তারাই অন্ধ বোবা, বধির এবং মৃত বলে পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখ করেছেন। মানব জাতির এইরূপ অবস্থায় করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের উদ্ধারকল্পে কোন একজন প্রেরিত মহাপুরুষকে ধরাধামে আবির্ভূত করেন। যিনি এসে এইরূপ মৃত দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে জীবন্ত করে তোলেন। তখন তাদের অন্তর চক্ষু খুলে যায়। অন্ধজনে ফিরে পায় তাদের দৃষ্টি শক্তি। বধির জনে ফিরে পায় শ্রবনশক্তি। বোবাগণ লাভ করে বাকশক্তি। তখন তারা দেখতেও পারে, বুদ্ধি বিবেক-বিবেচনার দ্বারা সত্যকে জানতে বুঝতে এবং গ্রহণ করে মিথ্যা ও ভেজাল বিষয়কে বর্জন করতে সমর্থ হয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি মৃত ছিল তৎপর আমরা তাকে জীবিত করলাম এবং তার জন্য এমন আলোর ব্যবস্থা করে দিলাম যার সাহায্য এলে জনগণ সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করতে পারে, সে কি তার ন্যায় হতে পারে, যার অবস্থা এমন যে, সে অন্ধকার রাশির মধ্যে পড়ে আছে যা থেকে বের হতে পারে না।" (সূরা আন আম) আধ্যাত্মিক জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেই যুক্তিপ্রমাণ বহির্ভুত আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী বাহ্যিক চর্ম চোখে দেখে থাকেন এবং আক্ষরিক অর্থে নিজেরা বুঝেন এবং সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে থাকেন বলেই মুসলমান জাতির আজ চরম অধপতন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যেন সেই ব্যক্তিই ধ্বংস হয় যে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে এবং যেন সেই ব্যক্তিই জীবিত হয় যে দলিল প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করেছে"। (সূরা আনফাল) হযরত ঈসা (আ.) মৃতকে জীবিত করতেন, এইরূপ বিশ্বাস পবিত্র কুরআন করীমের বিরোধী কথা হযরত রাসূল করীম (সা.) এর জীবনীতে নেই। হযরত ঈসা (আ.) অন্ধকে চক্ষু দান করতেন, কুষ্ট রোগীকে আরোগ্য করতেন এইরূপ বিশ্বাসে কি একথাই প্রমাণিত হয় না যে, অলৌকিক ঘটনাবলীতে ঈসা (আ.) হযরত নবী করীম (সা.) এর চাইতেও (নাউযুবিল্লাহ্) ক্ষমতাবান ছিলেন? খৃষ্টান-পাদ্রীগণ তো এ কথাই বলবে এবং বলছেও যে, দেখ, এসব অলৌকিক ঘটনাবলী আমাদের নবীর জীবনে যা ঘটেছে তোমাদের নবীর জীবনে তা ঘটে নি।

ইহুদীগণ হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ্ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)কে স্বশরীরে আসমানে তাঁর নিকটে তুলে নিয়েছেন এবং ঈসা (আ.)-এর সদৃশ একজন নকল ঈসা বানিয়ে দিলেন, যাকে সত্যিকারের ঈসা (আ.) মনে করেই ইহুদীগণ তাঁকে শুলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। প্রশ্ন এই যে, ইহুদীগণকে আল্লাহ্ তাআলা এই রকম ধোকা দিলেন কেন? ইহুদীগণ তো ইহাই বিশ্বাস করবে যে, আমরা মরিয়মপুত্র ঈসাকেই হত্যা করেছি। এখানে আসল কথা হলো এই যে, সদৃশ করা হয়েছিল। কার সদৃশ করা হয়েছিল? তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছিল। ক্রুশে টাঙ্গানোর ঘন্টা তিনেক পর তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত সদৃশ ক্রুশ থেকে নামানো হয় এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক গুহার মধ্যে রেখে তাঁকে সেবা শুশ্রূষা করা হয়। শিষ্যগণের সেবা শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিন দিন পর গুহা থেকে বের হয়ে ইহুদীগণের দৃষ্টিকে এড়িয়ে গোপনে মালির ছদ্মাবেশে গ্যালিলিতে শিষ্যগণের সাথে সাক্ষাত করেন। শিষ্যগণকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়ে গ্যালিলির এক পাহাড় অতিক্রম করে প্যালেস্টাইন থেকে হিজরত করে তিব্বত আফগানিস্তান হয়ে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে আগমন করেন এবং কাশ্মীরেই আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে একশত কুড়ি বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করে, শ্রীনগর খান ইয়ার মহল্লায় সমাধিস্থ হন।

হযরত ঈসা (আ.) আসমান থেকে নেমে এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। প্রশ্ন এই যে দাজ্জাল কে বা কারা? দাজ্জাল এসে মুসলমান জাতির ঈমান আকিদা সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে গেছে। কিন্তু মুসলমান জাতির এখনো হুঁশ হয়নি। তারা চেয়ে আছে কবে নাগাদ আরব্য উপন্যাসের সেই কিম্ভুতিকিমাকার দাজ্জালের আগমন হবে তারই অপেক্ষায়।

যারা সত্যকে মিথ্যা বানায় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রচার করে তারাই দাজ্জাল। যারা বলে খোদা এক পুত্র গ্রহণ করেছে। খোদা একজন নয়–তিনজন। খোদা এক খোদা, মরিয়ম এক খোদা, যীশু এক খোদা। তিনে এক, একে তিন। কুরআনের আলোকে সেই খৃষ্টান জাতিই দাজ্জাল।

তিনি শূকর বধ করবেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে শূকর বধ করতেই তো তার পঁয়তাল্লিশ বছর পার হয়ে যাবে এমতাবস্থায় মানুষকে হেদায়াত করবেন কখন? আসলে শূকর প্রকৃতির মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানিয়ে আল্লাহ্ ওয়ালা মানুষে পরিণত করবেন। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন। ক্রুশ বলতে লোহা, তামা, কাঁশা, পিতল কিংবা কাষ্ঠের নির্মিত ক্রুশ নয়। ক্রুশীয় মতবাদের মূল উৎপাটন ও বিলোপ সাধন করবেন তিনি। "সময়ের কসম নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে আছে, তারা ব্যতীত কে যারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে এবং তারা একে অপরকে সত্যের (প্রচারের) উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়।" (সূরা আল আসর)। অন্ধকে চক্ষু দিয়ে, বোবার মুখে বাণী ফুটিয়ে, বধিরকে শ্রবণ শক্তি দিয়ে, মৃত জনের দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে জীবিত করে তোলার জন্য আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি জগৎগুরু মানবমুকুট হযরত রাসূল পাক (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সঠিক সময়ে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তাঁর সংস্পর্শে মৃত দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। অন্ধজন ফিরে পায় তার দৃষ্টি শক্তি, বোবার মুখে বাণী নির্গত হয়। বধির জনে ফিরে পায় তার শ্রবণশক্তি। খোঁড়া লোক পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করতে সমর্থ হয়।

তিনি বিপুল পরিমাণে রাশি রাশি ধন সম্পদ বিতরণ করছেন কিন্তু অন্ধগণ তা দেখতেও পারছে না চিনতেও পারছে না। তাই সেই ধনরত্ন গ্রহণ করতে পারছে না। তিনি এসে ঐশী বাণী প্রাপ্ত হয়ে অকাট্য দলিল প্রমাণ দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত করে, কাশ্মীরে তার কবর দেখিয়ে ক্রুশীয় মতবাদকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণিত হওয়ায় খৃষ্ট ধর্মের কোন স্তম্ভই থাকে না। তাকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই মুসলমান জাতি আত্মিক, নৈতিক, জাগতিক উন্নতি লাভ করে হারিয়ে যাওয়া অতীতের গৌরব ঐতিহ্য পুণরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে। তাছাড়া মুসলমান জাতির হৃত গৌরব উদ্ধারের দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারী 'সকল ভাষা আল্লাহ্‌রই দান'

ইবনে শহীদ

আবার ফিরে এসেছে রক্তঝরা সেই মাস, শিমুল-পলাশ ফোটার মাস। এ মাসে আমাদের প্রত্যয় হোক, সর্বস্তরে আমরা মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠা করব। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি...। সেই অমর একুশে ফেব্রুয়ারি মাস এই ফেব্রুয়ারী। ১৯৫২ সালের এই মাসের ২১শে ফেব্রুয়ারীর দিনে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' এ দাবিতে বাঙালিরা যখন রাজপথে নেমে এসেছিল, তখন পাকিস্তানিরা তার জবাব দিয়েছিল বুলেটের মাধ্যমে। বাংলার দামাল ছেলেরা মাতৃভাষা বাংলার জন্য বুকের তাজা রক্তে রাজপথ করেছিল রঞ্জিত। সেই রক্তের ছোঁয়া পেয়ে আশ্চর্য দ্রুততায় গোটা জাতি জেগে উঠেছিল তার শেকড়ের টানে। পাকিস্তানিদের সৃষ্টি করা সাম্প্রদায়িকতা তাতে কোন বাদ সাধতে পারেনি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি সেদিন এক হয়ে একটিই প্রতিজ্ঞা করেছিল- মায়ের ভাষার সম্মান রাখবই, নিজের সংস্কৃতিকে ধারণ করবই।

রক্তের বিনিময়ে এ বাংলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা। এক ঝাঁক থোকা থোকা নাম সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারের মতো অনেকের জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালি তাঁর ভাষা, স্বকীয়তা এবং গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিল।

রক্তের আখরে লেখা এই ২১শে ফেব্রুয়ারী । ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবতর উত্থান ও অভ্যুদয়ের দিন। একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের সংস্কৃতির হৃৎপিন্ড। বাঙলা আমাদের দেশমাতৃকা, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা আমাদের প্রিয় ভাষা। বাংলা ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সবার মাতৃভাষা। এই ভাষার মর্যাদার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল ধমাবলম্বীদের রয়েছে অবদান।

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে মর্যাদায় উন্নীত করতে ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু, দিতে হয়েছে লাখ প্রাণের তাজা রক্ত। মাতৃভাষার জন্য বুকের রক্ত দেয়ার যে ইতিহাস বাংলার বীর সেনারা সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে আর এমন দৃষ্টান্ত নেই। বুকের তাজা রক্তের আখরে সৃষ্টি বাংলাভাষা, সময় পরিক্রমায় ৭১-এর মুক্তি যুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বন্যায় এবং ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত আব্রুর বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন এই বাংলাদেশ।

বাংলা আমাদের প্রাণের ভাষা। এই ভাষার জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থকতা। একুশে ফেব্রুয়ারি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালিদের ঐক-চেতনার অগ্নিস্মারক। এই এক অবিনাশী, অনশ্বর-চৈতন্যের জ্যোতির্ময় শিখা।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে পাকিস্তানের তৎকলিন সময়ের প্রখ্যাত ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য ধর্মীয় নেতা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা, **হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) পাকিস্তানী শাসক মহলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা পূর্ব পাকিস্তানে উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করো না। এতে পাকিস্তানের অখন্ডতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাঝে ভাষার জন্য আলাদা মমত্ত ও ভালবাসা রয়েছে।"** (দৈনিক আল ফযল, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪৭)

সেই মহান ধর্মীয় নেতাকে বাঙালি লাখ জনতার পক্ষ থেকে লাখ সালাম। জান্নাতে তাঁর পদমর্যাদা আরও উন্নত হোক। তিনি তখন তার দিব্য দৃষ্টি দিয়ে পাকিস্তানের ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং শাসক মহলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী' তদ্রুপ শাসকদের কাছে এ সতর্ক বাণীর কোন মূল্যই ছিল না তখন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা ও মহান ধর্মীয় নেতার উপদেশটির মধ্যে ৪টি বিষয় ছিল। প্রথমত মাতৃ ভাষায় শিক্ষাদান, দ্বিতীয়ত পূর্ব পাকিস্তানের ওপর উর্দুকে চাপিয়ে না দেয়া, তৃতীয়ত উর্দু নিয়ে বারাবারি করলে পূর্বাঞ্চলটি পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে, শেষটি হলো, বাঙালিরা বাংলা ভাষাকে বিশেষভাবে ভালবাসে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী উর্দুভাষী খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫২-র ২৬শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে এক জনসভায় রাষ্ট্রভাষা উর্দূর পক্ষে বলে উঠলেন, "উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" এই ঘোষণা শোনার পর এর প্রতিবাদে বীর বাঙালিরা রাস্তায় নেমে এলো। ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা মায়ের দামাল সন্তানেরা প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার জন্য জীবন বিলিয়ে দিল। বাধ্য হয়ে সরকার বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে কাগজে কলমে স্বীকৃতি দান করলো। কিন্তু আন্দোলন থামলো না। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত নানারূপে আন্দোলনের ধারা চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত এক সাগর রক্তের বিনিময়ে জন্ম নিলো স্বাধীন বাংলাদেশ। আমরা ফিরে পেলাম আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে।

এ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, তাহলো অমর

এ রক্তাক্ত একুশের বিশ্ব স্বীকৃতি। **১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ রোজ বুধবার প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান সংস্থা UNESCO (ইউনেস্কো) ২১শে ফেব্রুয়ারীকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে ঘোষণা দিয়ে এবং তা ২০০০ সাল হতে বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা নিয়ে বাঙালি জাতিকে বিশ্বে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এ মহান কার্যাদি একদিনে সুসম্পন্ন হয়নি এর জন্য অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।**

আজ আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ প্রতি বছর এ নদী বিধৌত পলি মাটির মনুষ্যত্ব আর গণতান্ত্রিক সমর্থনে সাধারণ মানুষ কতটা নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক হতে পারে এবং কতটা আত্মত্যাগী হতে পারে এ বিষয়ে জানছে এবং আরও জানবে।

সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার আর একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদ ও দু'লাখ মা বোনের ইজ্জত হারানো শাশ্বত এ বাঙ্গালীর রক্তের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠা বাংলাদেশ, আজ পরম শ্রদ্ধার দেদীপ্যমান সারা বিশ্বের জনগণের কাছে।

অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত শস্য শ্যামল সবুজের সমারোহে ভরা নয়ন জুড়ানো আমার সাধের বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বের প্রতিটি ভাষাভাষীর মানুষের গর্বে ধন্য ও প্রাণের সম্পদ। স্বাভাবিকভাবে একুশ আজ প্রতিটি বাঙালির অহংকারের প্রতীক। একুশ প্রতিটি স্বাধীনতাকামী বাঙালির গর্ব, সাহস ও প্রেরণার উৎস। 'ইউনেস্কো'-এর সুদূর প্রসারী সিদ্ধান্তের ফলে একুশ আজ গোটা বিশ্বের সম্পদে দাঁড়িয়েছে।

প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের স্বীয় মাতৃভাষার মর্যাদা অপরিসীম। **আমরা জানি পৃথিবীতে যত নবী রাসূল এসেছেন তাঁরা সবাই নিজ নিজ মাতৃভাষাতেই তাদের প্রচার কার্য চালিয়েছেন। কুরআনের বর্ণনামতে জানা যায় সকল ভাষা আল্লাহ্‌রই দান।**

সকল জাতিতে যেমন রাসূল এসেছেন, তেমনি সকল জাতির ভাষাতেই ওহী ইলহাম নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জাতির স্বীয় মাতৃভাষাকে যথাযত মর্যাদা দিয়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় প্রধান চারটি আসমানি কিতাবের মধ্যে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি 'তাওরাত' হিব্রু ভাষায়, হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি 'ইঞ্জিল' সুরিয়ানী ভাষায়, হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি 'যাবুর' ইউনানী ভাষায় এবং বিশ্ব ও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি 'আল কুরআন' আরবী ভাষায় নাযিল হয়। হযরত রাসূল করীম (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। তাঁর কাছে মানবজাতির দিশারী এবং সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে সর্বশেষ আসমানী কিতাব 'আল কুরআন' অবতীর্ণ হয়। এ ঐশী ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ভাষা আরবী। বিশ্ব নবীর মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন, "আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি তা দিয়ে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার" (সূরা মরিয়ম ঃ ৯৮)।

তাই আমরা বলতে পারি কোন ভাষা অপবিত্র নয় বরং সকল ভাষাই ঐশী ভাষা। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাতৃভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব ও সম্মান দিয়ে থাকে, আর আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতাও মাতৃভাষার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন তিনি এক স্থানে উল্লেখ করেছেন, "নামাযের মধ্যে নিজের ভাষায় দোয়া করা উচিত। কেননা, নিজের ভাষায় দোয়া করলে পূর্ণ আবেগ সৃষ্টি হয়" (মালফুযাত, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৪)।

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, "নামায আশিস মন্ডিত হবে না যতক্ষণ না নিজের ভাষায় নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা না কর। ...মাতৃভাষায় মানুষের বিশেষ এক সাধ মিশ্রিত থাকে। এ জন্য নিজের ভাষায় অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে নিজের কামনা-বাসনাকে রাব্বুল আলামীনের কাছে নিবেদন করা উচিত" (মালফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৫)।

তাই প্রত্যেক আহমদী মুসলমান কুরআন হাদীসের নির্ধারিত আরবী দোয়াগুলো পাঠ করার পর নিজ নিজ মাতৃভাষায় সেজদায় অবশ্যই দোয়া করে থাকে। এছাড়া সারা বিশ্বের আহমদীয়া জামা'তের মসজিদগুলোতে জুমুআর খুতবাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রদান করে থাকে। যার ফলে এটাই প্রতিয়মান হয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নিজ মাতৃভাষাকে কত বেশি মূল্যায়ন করে।

বাঙলা বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৫ম ভাষা। আর আমাদের রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা। এ ভাষার প্রগতি, উন্নতি উৎকর্ষের জন্য কারো কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তের বিনিময়ে বাঙালি খুঁজে পায় নিজস্ব সত্তা। আর এর ফলেই বাঙালি লাভ করে স্বাধীন রাষ্ট্র।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে নিজ মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমতার বন্ধন সৃষ্টি করে দিক আর আজকের দিনে বাঙালি সংস্কৃতির নামে যে বেহায়াপনা করা হচ্ছে তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। গভীর ভাবে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব বীর শহীদ ও বীর সৈনিকদের যারা এ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং লড়েছেন। আমরা যেন আমাদের লেখায়, কথায়, চলনেবলনে মাতৃভাষাকে আরও বেশি করে বিশুদ্ধভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করি।

২১শে ফেব্রুয়ারী "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" উপলক্ষ্যে আমরা গভীর ভাবে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব বীর শহীদ ও বীর সৈনিকদের যারা এ ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন এবং লড়েছেন।

সরল পথ, সহজ পথ ঃ সিরাতুল মুস্তাকিম

ফরিদ আহমদ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী

১। ইমাম নাছিম মাহদী সাহেব একজন উচ্চস্তরের আলেম–ইসলামী চিন্তাবিদ তো বটেই ইসলামী কর্মবিদও তিনি। বিশেষত: ইসলামী অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম জ্ঞান এবং মিশনারী কর্মদক্ষতায়ও বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। বর্তমানে আমাদের দেশের, অর্থাৎ U.S.A বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মিশনারী ইনচার্জ পদে ডেপুটি আমীরের মর্যাদায় তিনি কর্মরত। তিনি থাকেন হেড কোয়ার্টার ওয়াশিংটনে। আগে ছিলেন কানাডায় এবং ওখানে বহুদিন ছিলেন; ডেপুটি আমীরের মর্যাদায় মিশনারী ইনচার্জ পদে' কানাডার জলসা সালানায় তাঁর বক্তৃতা আরও দু-দু'বার শুনেছি; সে কথা থাক।

২। ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ রোববার ছিল আমাদের West coast Region অর্থাৎ পশ্চিম উপকূলীয় এলাকার তিন দিন ব্যাপী ২৫তম জলসা সালানার শেষ দিন। ক্যালিফরনিয়া ষ্টেটের চিনু মসজিদ ছিল জলসার অনুষ্ঠান কেন্দ্র। পূর্ব নির্ধারিত সূচী মোতাবেক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ইমাম সাহেব। বিষয়বস্তু ছিল "Zikr-e-Habib : Rememberance of Hazrat Aqdas Masih-e-Maud (As) (যিকরে হাবীব হযরত মসীহ্ মাওউদ আ.-এর স্মরণে)। ইংরেজিতে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বন্ধুদের সামনে কত বিনয়ের সহিত নিজেকে পেশ করতেন, এ প্রসংগে একটি খুবই মুখরোচক কাহিনী তিনি শোনালেন ঃ

"এক সাহাবী : হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী (র.), কাদিয়ানেই থাকতেন একবার নাকি কাদিয়ানে লা-ওয়ারিশ কুকুরের ভীষণ উপদ্রব হল। কুকুরের জ্বালায় লোকজনের স্বাচ্ছ্যন্দে বাইরে চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে গেল। একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উক্ত সাহাবী (রা.)-কে অনুরোধ করলেন এলাকার লা-ওয়ারিশ কুকুরের উপদ্রব কমাবার কিছু ব্যবস্থা নিতে। সাহাবী (রা.) সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নিলেন। অনেক লা-ওয়ারিশ কুকুরকে মেরেও ফেললেন। কুকুরের উপদ্রব তখনকার মত কমে গেল বটে কিন্তু আর এক উপদ্রব শুরু হল–এ উপদ্রব শুধু পীর সাহেবের জন্য। তিনি রাস্তায় বের হলেই গ্রামের লোকজন বিশেষত: ছোট ছোট ছেলেদের দল "হে হেই 'কুত্তে মার; 'কুত্তে মার মৌলবী' বলে উনাকে উত্যক্ত ও বিরক্ত করতে লাগল। এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে উনাকে দেখলেই অনেক সময় ছেলে ছোকরার দল দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ত।

একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিজের হাল অবস্থা জানিয়ে বললেন "হুযূর আমাকে দেখলেই গ্রামের লোক–ছেলে বুড়ো সবাই "কুত্তে মার, 'কুত্তে মার' বলে হৈ চৈ শুরু করে। আমার নাম রেখেছে 'কুত্তেমার মৌলবী'। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নীরবে শুনলেন। একটু হেসে উনার হাত ধরে বললেন–"দেখুন আমার নিজের কয়েকটি পদবীর মধ্যে একটি পদবী হল "শূয়র মার" (অর্থাৎ শূকর বধকারী) আপনার 'লকব' আমার লকবের চেয়েও উপরে"।

জলসায় উপস্থিত সবাই হো-হো করে হাসল।

৩। জলসা শেষে নাছিম মাহদী সাহেবের সাথে দেখাও হল, খাওয়ার মারকিতে বা তাঁবুতে। শেষ কুশল বিনীময় হল। তখন কিছুই মনে আসেনি। বাসায় এসে রাত্রে হঠাৎ মনে পড়ল– আরে আরও এক "মার" তো রয়ে গেল। নাছিম মাহদী সাহেব এ "মার" সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। বাংলাদেশের বাইরে হয়ত কোন আহমদী জানেও না যে, সে "মার" হল 'ইছামার'–ইছামারা মৌলবী"। যার প্রকৃত নাম মৌলবী আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ (রা.), চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রাম। সুবে বাংলার অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার পশ্চিম বাংলাসহ পূর্ব ভারতের বাঙ্গালি অধ্যুষিত এলাকার সর্বপ্রথম বাঙ্গালী যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে সরাসরি বয়আত নিয়েছিলেন পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে। সে হিসাবে তিনি সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী মর্যাদার লোক।

সন তারিখ আমার মনে নেই। উনার সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু জানিও না। তবে এই টুকু জানতে পেরেছি যে তিনি সে সময় রেংগুন শহরে কর্মরত ছিলেন। যখন জানতে পারলেন যে ভারতের পাঞ্জাব এলাকায় ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। গুরুদাসপুর জেলার বাটালা তাহসিল কাদিয়ান গ্রামে মির্যা গোলাম আহমদ নামক এক ব্যক্তি নিজেকে ইমাম মাহদী (আ.) হওয়ার দাবী করেছেন তখনই তাঁহার পূর্বজ্ঞান ও পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে সত্য সত্যই ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন।

দেশে ফিরে এসে তিনি প্রচার শুরু করলেন–"ইমাম মাহদী জাহির হয়েছেন", মরিয়ম পুত্র হযরত ঈসা (আ.) আসমানে যিন্দা নাই, জমীনেও না। ক্রুশেও তাঁর মৃত্যু হয়নি বা আসমানেও তিনি উঠেননি। আল্লাহ্‌র সম্মানিত নবী ছিলেন তিনি। তাঁর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অন্যান্য নবী (আ.) দের ন্যায় পরিণত বয়সেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর শহরে খান ইয়ার মহল্লায় তাঁর কবর রয়েছে। আল্লাহ্ কাউকেও মৃত্যুহীন সৃষ্টি করেন নাই, সবাই মরে যায় এটাই আল্লাহ্ তাআলার অমোঘ নিয়ম।"

তখন দেশের অজ্ঞ ও কুসংস্কারে মগ্ন পরস্পর ফিৎনা-ফাছাদে লিপ্ত ওলামাকূল কুৎসা ছড়ায়ে দেশের মুখ ও সর্বদিকে পশ্চাদপদ মুসলমান জনসাধারণকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল এবং তার নাম দিল 'ইছামারা মৌলবী"। তাকে দেখলেই পাড়ার মুর্খ ছেলে বুড়োর দল "ইছামারা মৌলবী–'ইছামারা মৌলবী" বলে তার পিছু লাগত, ঢিল মারতো এবং তাকে বিরক্ত ও উত্যাক্ত করতো।"

–আমার মনে এল–কিন্তু এটাতেই সত্য, এবং দিশা– Three Points make one straight time

শূয়র মার, কুত্তা মার, ও ইছা মার' তিন বিন্দুর একটি সরল রেখা, সরল ও সহজ পথ; সিরাতুল মুস্তাকীম।

স্কুল

কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতারণার মোবাইল

(সকলের ভেবে দেখা দরকার)

খালিদ আহমেদ সিরাজী

মানুষকে প্রতারিত করার হাজার অনুষঙ্গের মধ্যে বিগত কয়েক বছর ধরে যুক্ত হয়েছে মোবাইল ফোন। এই আধুনিক যুগের আধুনিক মোবাইল ফোনে প্রতারণার সবচেয়ে বেশী শিকার হচ্ছে মেয়েরা। সুনির্দিষ্টভাবে বললে বলতে হয় টিনএজ মেয়েরা। বর্তমান যুগের আধুনিক পিতা মাতার আধুনিক স্কুল/কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের সিংহ ভাগের হাতে মোবাইল ফোন। এদের অনেকেই হয়তবা ছেলে, মেয়েদের খোঁজ খবর নেওয়ার দোহাই দিবেন কোন কোন পরিবারগণ।

আবার কোন পরিবার তথাকথিত আভিজাত্য রক্ষার জন্য মোবাইল হাতে তুলে দিয়েছে। এভাবে বিশেষ করে স্কুল, কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে মোবাইলে আসক্ত হচ্ছে। যা এখন মহামারি আকার ধারন করেছে।

যেহেতু মোবাইল ফোনে ছেলে মেয়েদের তেমন কাজ কর্ম খুবই কম বিধায় অনেকেই ব্যবহারের আগ্রহ হারাতে বসেছে। কিন্তু মোবাইল আসক্তির কারণে ছাড়তেও পারছেনা আধুনিক মোবাইলটি। অযথা মোবাইল নাড়া চাড়া করতে করতে বিভিন্ন মানুষদের মাঝে মিসকল দেয়ার অভ্যাস গড়তে শুরু করে এবং অনেক বিপদ ডেকে আনে। তারই অজস্র উদাহরণ দেওয়া যাবে। শুধু কি তাই? স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলে মেয়েরাও নয়, এ ধরনের অভ্যাসে জড়িয়ে পড়েছে কিশোর থেকে মাঝ বয়সী মানুষ, (মোবাইল ফোনের মাধ্যমে) নিজেদের পরিচয় গোপন করে তারা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে অপরিচিত মেয়েদের সাথে ভালবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তবা অবুঝ মেয়েটিও তার সাথে কথা বলত মজা করার জন্য, কিন্তু আস্তে আস্তে সেই অপর পক্ষের চটুল কথার ফাঁদে পড়ে, মনের অজান্তে সে আধুনিক মোবাইলের ফিসফিসানির রাত জাগানো গল্পের নেশাতে জড়িয়ে পড়ে। আর এভাবে তারা ভালবাসায় জড়িয়ে পড়ছে আবেগের বশবর্তী হয়ে।

একবারও চিন্তা করেনা অপর পাশের ঐ মানুষটি আদৌ সৎ কিংবা নেক কিনা। অনেকে এভাবেও তাদেরকে প্ররোচিত করে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্নভাবে। অনেক ক্ষেত্রে ভিডিও করে রাখছে ব্ল্যাক মেইলের জন্য।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকার খবর অনুসারে দেখা যায়, অনেককে বিশেষ করে মেয়েদের লালসার শিকার হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তাই সত্য কথা এই যে, বাস্তব জীবনে ছেলে মেয়েরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করার কারণে ঘটে যায় অনেক অনাকাঙ্খিত ঘটনা। প্রাণ কোকিলার মোবাইল ফোনের ডাকে অনেক অবুঝ ছেলে মেয়েরা হয়তো সাড়া না দিয়ে পারে না।

তবে মোবাইল ফোনের মন্দ কথা বলা কিংবা শুনাকে সহনশীল পর্যায়ে রাখতে চেষ্টা করেন অনেক মোবাইল ব্যবহারকারি। চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও যদি অ-পবিত্র কথাবার্তা শ্রবন থেকে মুক্ত থাকা না যায় তখনই যত বিপত্তি সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে নয়, বিশ্বের সকল দেশে তা আছে এবং থাকবে।

কিন্তু বর্তমানে এই ভয়ংকর যন্ত্রটি আমাদের, বিশেষ করে স্কুল, কলেজ পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের হাতে বিপদজনক বিষফোড়া হাতিয়ার হিসাবে দেখা দিয়েছে। অনেক সময় পিতা-মাতারা ছেলে, মেয়ের খবরাখবরের প্রয়োজনে কিংবা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্তানের হাতে মোবাইল ফোনটি তুলে দেন। মোবাইল ফোনটি হাতে পাবার পর তারা এর কি অপব্যবহার করছে তা তলিয়ে দেখা সম্ভব নয়।

কেননা- মেমোরি কার্ড সমৃদ্ধ মোবাইল ফোনে বিভিন্ন অসামাজিক অশ্লীল কার্যকলাপের ভিডিও চিত্র আপত্তিকর ডকুমেন্ট ইত্যাদি ধারণ করে মুহুর্তেই ডাউন লোড করা যায়। অশ্লীল ছবির ডিভাইসের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে যাচ্ছে একে অপরের কাছে। এখান থেকে পরিত্রানের উপায় সকলকে খুঁজতে হবে। সেই সাথে এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

মোবাইল পরিশুদ্ধ করতে সবার আগে প্রয়োজন কোন অজুহাতে সাড়া না দিয়ে বিশেষ করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের হাতে মোবাইল ফোন না দেয়া। মোবাইলের সুফলের পাশাপাশি এর কুফলের দিকটাও বুঝতে হবে। হাদীস বুখারী, মুসলিম শরীফ হতে জানতে পারি অনেকরকম যিনাহর মধ্যে মুখের এবং কানের যিনাহর থেকে সমগ্র মানব জাতিকে সাবধান করেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। এই বিতর্কিত আধুনিক মোবাইল ফোনে মন্দ কথা বলা এবং শ্রবন যে যিনাহর পর্যায়ে, একথা সকলের ভেবে দেখা দরকার।

শিক্ষাজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মোবাইল ফোনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে মেয়েদের হেফাজত করতে লেখালেখি কিংবা উপদেশ দিয়ে তেমন একটা লাভ হবেনা বলে আমি মনে করি, যতদিন পর্যন্ত না মানুষের নৈতিকতার পরিবর্তন হবে। আর এইজন্য দরকার পারিবারিক সচেতনতা।

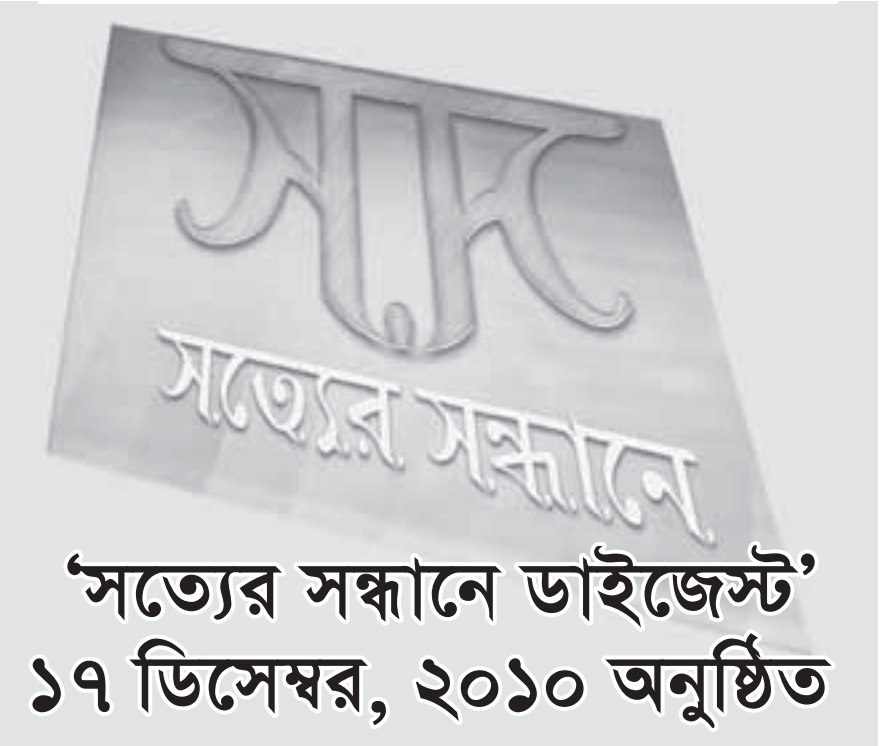

‘সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট’ ১৭ ডিসেম্বর, ২০১০ অনুষ্ঠিত

সুধি পাঠক! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, হুযূর (আই.) এর নির্দেশক্রমে এখন হতে ‘সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট’ নামে পাক্ষিক আহমদী-তে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হবে, যারা অপারগতায় অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন না বা দেখতে পারেন নি তারা এ অধ্যায় হতে অবশ্যই উপকৃত হবেন। কিন্তু সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে অনুষ্ঠান দেখার বিকল্প নেই। অ-আহমদী বন্ধুদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমেই এ অনুষ্ঠান সর্বাধিক সফল হতে পারে।

-মোহাম্মদ সোলায়মান, মুবাশ্বের মুরব্বী

বিঃ দ্রঃ এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত প্রশ্নোত্তর সরাসরি সম্প্রচারিত ‘সত্যের সন্ধানে’ অনুষ্ঠান হতে কাট ছাঁট ও সংক্ষেপ করে পাঠকের পিপাসা নিবারনের জন্য পেশ করা হয়েছে।
বিস্তারিত উত্তর শুনতে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখুন বা আমাদের www.ahmadiyyabangla.org ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

প্রশ্নঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক, ঢাকাঃ *আমরা লোক মুখে শুনি হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বশেষ নবী এবং রাসূল। তারপর নতুন কোন রাসূল আসবেন না। আবার শুনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতাও নাকি নবী। আমার প্রশ্ন হল যদি মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ রাসুল হয়ে থাকেন। তাহলে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা আবার কেমন নবী?*

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ হযরত আকদাস মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) অবশ্যই শেষ নবী। যে অর্থে কুরআন ও হাদীস তাকে শেষ নবী বলছে। কুরআন ও হাদীস পড়ে দেখুন কী অর্থে হুযূর (সা.) শেষ নবী। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৪ শেষ অংশ)।

ধর্ম শেষ হয়েছে, শেষ সম্পূর্ণ ধর্মকে এনেছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মুজতবা (সা.)। যে নবী ও রাসূল শেষ শরীয়ত নিয়ে আগমন করেন সে নবীকে বলা হয় শেষ শরীয়ত বাহক নবী। এই অর্থে তিনি শেষ নবী। একজন মানব রাসূল যত উচ্চতা ও নৈকট্য লাভ করতে পারে তিনি লাভ করেছিলেন। যে নবী নবুওয়াতের উৎকর্ষের শেষ সীমানায় গিয়ে উপনীত হন তিনি শেষ নবী। এই অর্থে শরীয়তের দিক থেকে শেষ নবী এবং উৎকর্ষের শেষ সীমানায় উপনীত হওয়ার দিক থেকে শেষ নবী। তাঁর পরে কোন শরীয়ত নিয়ে কেউ আসতে পারে না। আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষি আমরা সবসময় একটা কথা বলে থাকি তা হলো, ‘এই হল আমার শেষ কথা’। কোন একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়ে গেলে আর বলা হল, ‘এই আমার শেষ কথা’ এর অর্থ কি আমি আর কোন কথা বলব না? বিচারক কি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার পর আর কথা বলেন না? যে নবী চূড়ান্ত নবী হিসাবে আসেন, যার শিক্ষা কখনও পরিবর্তনীয় নয় তাকে বলা হয় শেষ নবী এই অর্থে হুযূর (সা.) শেষ নবী। তাহলে কি নবী আসতে পারেন? হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনিত শেষ শরীয়তের মধ্যে তার উল্লেখ আছে। সূরা নিসা ৭০ নম্বর আয়াতে।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

মিনান নবিয়্যীনা অর্থাৎ নবীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। **ওয়া সিদ্দিকীনা** এবং সিদ্দিকদের অন্তভুক্ত হবে। **ওয়াস শুহাদায়ে** এবং শহীদদের অন্তভূক্ত হবে। **ওয়াস সালেহীনা** এবং সালেহীন বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবে। এ চার ধরনের পুরস্কারের ৪টিই পাওয়া সম্ভব। শর্ত হল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্য করতে হবে। যখন যুগের চাহিদা থাকে আল্লাহর অনুগ্রহ হয় তখন আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদের মাঝ থেকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাউকে বেছে নিয়ে উম্মতি

নবী বা আনুগত্যের নবুওয়াত দিতে পারেন। এই কারণেই মুসলীম শরীফ-এর কিতাবুল ফিতন অধ্যায়ের হযরত নওয়াব বিন হাসান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন পরবর্তীকালে নবীউল্লা ঈসা আসবেন আর এই হাদীসে চারবার নবীউল্লাহ ঈসা বলা হয়েছে। আগের নবী মারা গেছেন পরের নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর গুণে গুনান্বিত হয়ে আসবেন। কিন্তু তার মর্যাদা কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিনি নবী উল্লাহ। এটাকে বলা হয় উম্মতি নবী, আনুগত্যকারী নবী।

প্রতি ১০০ বছর পর পর যে ইসলামের প্রাসাদে ধুলা জমে যে ঝুল জমে সেটাকে পরিস্কার করার জন্য মুজাদ্দেদ আসবেন। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, 'ইন্নাল্লাহা ইয়াবআসু লেহাযিহিল উম্মাতে আলা রাসে কুল্লে মিআতে সানাতিম মাইউজাদ্দেদু লাহা দিনাহা' (আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম)। হুযূর (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় আমার এই উম্মতের সংশোধন কল্পে প্রত্যেক হিজরী শতাব্দির শিরোভাগে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করবেন যিনি সংস্কার সাধন করবেন। কেউ কবর পুজা আরম্ভ করেছে সেটার বিরুদ্ধে একটা খাটি শিক্ষা দিবেন, কেউ ব্যবসা বানিজ্য নষ্ট করছে, ব্যবসা বানিজ্যের মধ্যে অসৎ পদ্ধতি অবলম্বন করছে তার জন্য মুজাদ্দেদ আসবেন। কেউ সততা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আসবেন। কেউ অন্যান্য চারিত্রক দোষ-ত্রুটি এবং ভুল ভ্রান্তি দূর করার জন্য আসবেন। ১৪ শতাব্দি হিজরীতে অর্থাৎ চতুর্দশ হিজরী শতাব্দির শিরোভাগে যার আসার কথা ছিল তিনি পূর্ণ চন্দ্র ছিলেন, পূর্নিমা ছিলেন এবং সেই পূর্ণ চন্দ্রের নাম ইমাম মাহদী প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)। জাগতিক বিশ্ব আমরা দেখি চতুর্দশ রাতে পূর্নিমার চাদ উদ্ভাসিত হয়। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে হুযূর (সা.)-এর সূর্য অস্তমিত হবার পর চতুর্দশ শতাব্দিতে যার আসার কথা তিনি পূর্ণ চন্দ্র হযরত ইমাম মাহদী (আ.), চন্দ্র সূর্য্যের গুণে গুণান্বিত হয়ে আসেন নিজস্ব কোন আলো বিকিরণ করা তার দায়িত্ব নয়। তার নিজস্ব কোন আলোই নাই। এই হচ্ছে মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর নবুওয়াত।

প্রশ্নঃ মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান, রংপুরঃ *১০ ই মহররম-এর দিনে আমাদের এই উপমহাদেশে যে সকল আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত তা কুরআন হাদীস কতটা সমর্থন করে?*

মওলানা ফিরোজ আলমঃ মহররম সম্পর্কে স্মরণ রাখতে হবে, মহররম শুধু কারবালার ময়দানে যে ঘটনা ঘটেছে এই জন্যই প্রসিদ্ধ নয়। অবশ্যই এটি এক করুণ এবং হৃদয় বিদারক ঘটনা। বুখারী শরীফে আছে ইহুদীরা এই দিন রোযা রাখতো, রাসূল করীম (সা.) বললেন, আমরা এই দিন রোযা রাখার বেশী অধিকার রাখি। কেননা এই দিনে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ.)-কে মুক্ত করেছিলেন।

সেজন্য ১০ মহররম অনেকেই রোযা রেখে থাকেন। এবং যেখানে যার জন্য সম্ভব আহমদীরাও রাখে। কিন্তু এই মহররমে কারবালাতে হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র বংশের উপর। এজন্য বিশ্বের সব মুসলমান যারা রাসূলুল্লাহর প্রতি ভালবাসা রাখে তারা সত্যিই ব্যথিত মর্মাহত আর কোন ভাষাই এই দুঃখ এবং এ বেদনাকে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট নয়। আর এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশের প্রকাশ্য অবমাননা। হুযূর (সা.) বলেছেন, যে আমাকে ভালবাসে তার হাসান এবং হুসাইনেকেও ভালবাসা উচিত। এই যে হৃদয় বিদারক ঘটনা এর স্মরণে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যে আচার আচরণ হচ্ছে মানুষ নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, শোক গাঁথা গাইছেন অনেকে নিজেকে সেই সময়কার কথা স্মরণ করে নিজের দেহকে ক্ষত বিক্ষত করছেন। তাদের যে আন্তরিকতা এটিকে আমরা আক্রমন করবনা, আমাদের কোন অধিকার নেই। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুঃখ প্রকাশেরও ভাষা শিখিয়েছেন। দুঃখ বেদনা শোক কিভাবে প্রকাশ করতে হয় তা আমরা দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে। উহুদের ময়দানে এত বড় ক্ষতি হয়েছে, তখনও রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু কেউ যখন অতি বারাবারি করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটি নিষেধ কর। আর যদি চুপ না করে, তার মুখে মাটি ঢুকিয়ে দাও। আমরা এটি সার্টিফিকেট দিচ্ছি না, যারা বারাবারি করে তাদের জন্য এটি করা উচিত। দুঃখ প্রকাশেরও ভাষা আছে যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে আমরা দেখতে পাই। সেই রীতি অবলম্বন করা উচিত। অপর দিকে যারা শিয়াদের বিরোধীতায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বংশকে গালি দিতে দ্বিধা করে না তারা মুহাম্মদ (সা.) এর শাফায়াত এর কাছা কাছি আসতে পারবে বলে মনে হয় না। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন, যে আমাকে ভালবাসে তার উচিত আমার আল, আমার পরিবার, বিশেষ করে হাসান এবং হোসেন-এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা। ন্যায় বিচারক হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ (আ.) এসে এই রীতিই আমাদের শিখিয়েছেন।

প্রশ্নঃ ফিরোজ আলম, জলপাইগুড়িঃ *আত্মার স্বরূপ কী? এবং জগতের সাথে এর সম্পর্ক কী?*

মওলানা ফিরোজ আলম ঃ আত্মার স্বরূপ কী? আত্মা সম্পর্কে স্মরণ রাখতে হবে যে ইসলামের যে ঐশী গ্রন্থ তাতে আছে

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ
الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا
أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(সূরা বনী ইসরাঈল, ৮৬)

তারা অর্থাৎ মানুষ তোমাকে আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল যে আত্মা আল্লাহ তাআলার বহিঃপ্রকাশের নাম। আল্লাহর ইচ্ছায় তা সৃষ্ট। কিন্তু মানুষকে সীমিত জ্ঞান দেয়া হয়েছে। তো এই আয়াত থেকে আমরা এটি বুঝি যে, আত্মা আসলে আল্লাহর ইচ্ছায় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মানব জাতি যাদের চিন্তা ধারা এবং যাদের ফেকালটি তাদের শক্তি যোগ্যতা এবং সামর্থ্য এর একটা সীমা আছে।

এই সীমার ভিতর যারা সীমিত তাদের জন্য আত্মাকে পুরোপুরি বুঝা সম্ভাব নয়। দেহে আত্মার উপস্থিতি তেমনি যেভাবে পাথরে অগ্নির উপস্থিতি। আপনি বাহ্যত আগুন দেখেন না। কিন্তু আগুন আছে। ঘর্ষনের ফলে সামনে আসে একইভাবে মানবদেহে আত্মা রয়েছে, কিন্তু সেটি বুঝার জন্য বিশেষ পরিস্থিতি, বিশেষ ক্ষণ এবং বিশেষ মূহুর্তের প্রয়োজন হয়। আল্লাহর মতো আত্মাও চিরস্থায়ী, অনাদি, অনন্ত সব সময় সর্বদা বিরাজ করছে এটি ভুল কথা। আত্মা ইশ্বরের এবং পরমেশ্বরের একটা সৃষ্টি। যদি আত্মা পূর্বেই সৃষ্ট হয় ইশ্বরের সাথে সহঅবস্থান করে, তাহলে আত্মার ইবাদতের দাবী করার ইশ্বরের কোন অধিকার থাকে না। আত্মা সম্পর্কে চুড়ান্ত এবং শেষ কথা হলো, এটি ইশ্বরের সৃষ্ট এবং এর উপস্থিতির কথা আমি বলেছি সেভাবে অনুভুত হয় যেভাবে পাথরে অগ্নি অনুভব করা যায়।

প্রশ্নঃ মোহাম্মদ আনামুল হক, চর বৈশাখী, নোয়াখালীঃ *আপনাদের এ অনুষ্ঠানে এসে ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। এখন আমার গ্রামে গিয়ে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই তাই আমাদেরকে একটু নসীহত করবেন।*

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ হযরত আকদাস মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহ তাঁকে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে নবী, হে রাসূল, তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি তুমি এ কাজটা না কর আর সমস্ত দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও আমি বলছি তুমি তার বাণী পৌঁছালে না। ওয়াল্লাহু ইয়াসেমুকা মিনান নাস। আমরা খুব ভাল করে জানি তোমার বিরোধিতা হবে। লোকেরা তোমাকে খারাপ বলবে, আক্রমণও করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি যে আদেশ অবতীর্ণ হয় সেটা কিন্তু আমাদের উপরও বর্তায়। অতএব, মুসলমান হিসাবে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নত পালন করতে পারি। আল্লাহ আপনাদেরকে যে নেয়ামতের সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে সেখানে ফেরত গিয়ে সুবর্নের চর, চর বৈশাখী এলাকায় ছড়িয়ে দিন। গিয়ে বলুন, আমরা সংবাদ পেয়েছি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) নামে এক ব্যক্তি দাবী করছেন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ এবং মাহদী। চল যাই, আমরা যাচাই করি, বাছাই করি, কুরআন ও হাদীস খুলে দেখি তাঁর সত্যতা খুঁজে পাই কিনা? এটাই হচ্ছে আপনাদের প্রধান দায়িত্ব। আর দোয়া করা, হে আল্লাহ! হে সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞানী, তুমি জীবন্ত আমি এক অধম বান্দা তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে দোয়া করি আমাকে পথ দেখাও। আমাকে জানাও, মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সত্য না মিথ্যা। আর তুমি আমাকে জানিয়ে দাও তুমি যা জানাবে আমি সেটা পালন করব। যদি না জানাও তাহলে কিয়ামতের দিন আমাকে দোষী করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ মিসেস হুমায়রা খন্দকারঃ *ইমাম মাহদী (আ.) কে মানার গুরুত্ব কী এবং তাঁর সত্যতার প্রমান কী?*

মওলানা ফিরোজ আলমঃ ইমাম মাহদী আমাদের নিজস্ব কোন আত্মীয় নন। ইমাম মাহদী হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) এর প্রতিশ্রুত মাহদী। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে বলেছেন, আমার উম্মত যখন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে, নৈরাজ্য দেখা দিবে, চারিত্রিক অবক্ষয় দেখা দিবে সে যুগে উম্মতকে রক্ষা করার জন্য আমার উম্মতের মধ্য থেকে মাহদী আসবেন। এবং উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন তাকে মানর জন্য। তিনি (সা.) এ কথাও বলেছেন, তোমাদের সামনে যদি বরফের পাহাড়ও পড়ে সেই পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তার কাছে গিয়ে তার হাতে বয়আত করবে। কেননা তার মাধ্যমে ইসলামের বিজয় আসবে। এটি হল ইমাম মাহদীকে মানার গুরুত্ব।

সত্য ব্যক্তি যখন আসেন কুরআন শরীফে আছে যে, আল্লাহ তাআলা সত্য ব্যক্তিকে সত্য মহাপুরুষকে বিশেষ করে যিনি নবী এবং রাসূল হয়ে থাকেন তাকে আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যের জ্ঞান দান করে থাকেন। সূরা জ্বিনে আল্লাহ তাআলা বলেন, **ফালা ইউযহিরু আলা গায়বিহি আহাদান ইল্লা মানির তাদা মির রাসূল**। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যের প্রভূত জ্ঞান পছন্দনীয় বা মনোনীত রাসূল ছাড়া অন্য কাউকে দান করেন না। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যেহেতু আল্লাহ তাআলার সত্য মাহদী তিনিও এই ধরণের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কিন্তু তিনি সব ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্বে বলেছেন আমি যা কিছু পেয়েছি মুহাম্মদী সমুদ্র থেকে পেয়েছি। মুহাম্মদ (সা.) এর দায়িত্বে এবং দাসত্বে পেয়েছি। তাকে আল্লাহ তাআলা অনেক সংবাদ দিয়েছেন যা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। সে সমস্ত সংবাদের শুধু একটা আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই। ১৮৯২ সনে আপনারা জানেন সে সময় ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে পরস্পর যুদ্ধ এবং প্রবল বিতর্ক চলছিল। এক ব্যক্তি যিনি বাহ্যত এক ভদ্র মানুষ ছিলেন তিনি ঘোষনা করেন ১৮৯২ সনে অর্থহীন বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য্য এক জায়গায় একত্রিত হয়ে উপস্থাপন করি। তাহলে মানুষ সিদ্ধান্ত করতে পারবে সত্য কোথায় আর সৌন্দর্য্য কোথায়। এই ঘোষনা দেন এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ জানান। খৃষ্টান এবং মুসলমানদেরকে তিনি আমন্ত্রণ জানান এবং পাঁচটি প্রশ্ন তিনি উল্লেখ করেন। এই পাঁচটি প্রশ্ন আপনারা উত্তর দিন নিজ নিজ ধর্মের ভিত্তিতে। ইসলামের পক্ষ থেকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাকে জানিয়েছেন, হ্যা ইসলামের পক্ষ থেকে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরার জন্য কুরআনের ভিত্তিতে আমি আপনার এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করছি এবং এই প্রবন্ধ লেখা কালেই আল্লাহ তাআলা তাকে অবহিত করেন যে তার এই প্রবন্ধ অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। 'ইন্নাল্লাহা মাআকা ওয়া ইন্নাল্লাহা ইয়াকুন হাইসু মা তাকুন' আল্লাহ সেখানে আছেন যেখানে তুমি দন্ডায়মান হয়েছো এর অর্থ হলো সেদিন খোদার সাহায্য তোমার সাথে থাকবে। তো এই সমস্ত ইলহাম তিনি সেই প্রবন্ধ পঠিত হবার অনেক পূর্বেই ঘোষনা করেছেন এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে এটি প্রচার করেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে জানিয়েছেন আমার প্রবন্ধই জয়যুক্ত হবে। এই প্রবন্ধ পাঠ করেন আব্দুল করীম শিয়ালকোটি (রা.) এই প্রবন্ধ পড়ার জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ২ ঘন্টা। কিন্তু এই প্রবন্ধের আবেদন, নিবেদন এবং আকর্ষন এত জোড়ালো ছিল যে, ২ ঘন্টায় যখন প্রবন্ধ শেষ হল না তখন সবাই ৫০০০ এর মত শ্রোতা সেখানে ছিল সকলে দাঁড়িয়ে সমস্বরে বলল আপনি আপনার প্রবন্ধ অব্যাহত রাখুন আমরা শুনতে চাই। যিনি সভাপতি ছিলেন তিনি দেখলেন সময় শেষ, সবার অনুরোধে অনুষ্ঠান একদিন বর্ধিত করা হয়। এবং এই প্রবন্ধ শেষ হওয়ার পর পাঞ্জাব প্রদেশে যে সমস্ত পত্র পত্রিকা ছিল সব পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে ইসলামের পক্ষে যে প্রবন্ধ পড়া হয়েছে সেটি আজকে জয়যুক্ত হয়েছে। আর সেই বাক্যই হুবহু ছাপা হয়েছে যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছিল যে, 'মযমুন বালা রাহা'। আর এই সংবাদ বেশ কয়েকটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এ পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয়েছে,সেদিন যদি এ প্রবন্ধ না হতো তাহলে ইসলামের সপক্ষে দাড়ানোর কেউ ছিল। মোটকথা যিনি সত্য প্রতিশ্রুত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ আশরাফুল হক, উথুলীঃ *হযরত মুহাম্মদ (সা.) এরপর যে খলীফা তাদের শাহাদাতের পর এবং হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন এর ওফাতের পরই কি ইসলাম ঐখানে স্থির হয়ে গেছে নাকি তারপরও চলমান ছিল।*

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ খিলাফতে রাশেদা শেষ হয়ে গেছে হযরত আলী এর মাধ্যমে। খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), হযরত উমর (রা.) হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) ইনারা হলেন খিলাফতে রাশেদার একেক জন খলীফা এবং এরপর মুজাদ্দেদীয়তের মাধ্যমে ইসলামের গতি অব্যাহত রাখা হয়। ইসলাম কখনও থেমে যায়নি। ইসলাম চলমান একটি প্রক্রিয়া, মুসলমানদেরকে পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা শেষ শরীয়ত কুরআন শরীফ এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষক হিসাবে রাসূলকে রেখেছেন। রাসূলের মৃত্যুর পর রেখেছেন খলীফাদেরকে। খলীফাদের অবর্তমানে নানা ধরনের আলেম ওলামা জন্ম হয়েছে এবং তারাও অমুল্য সেবা করেছেন। কিন্তু মুল দায়িত্বটা ছিল খলীফাদের পর মুজাদ্দেদীনদের, তাঁরা এসে ইসলাম সংস্কার করবেন, ভুল ত্রুটি কাটিয়ে দিবেন। এটা ছিল তাদের সীমাবদ্ধ

গন্ডিতে সীমাবদ্ধ পরিসরে আয়োজন। কিন্তু সর্বশেষ যুগ প্রতিশ্রুত ছিল যে, শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আসবেন। তার হাতে তোমরা বয়আত করবে। কেননা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হবেন, রাসূলের অনুসারী হবেন এবং তিনি রাসূলের ধর্মকে পুণর্জীবিত করবেন। যেটা তোমরা ভুলে গেছ যেটা তোমরা বুঝতে ভুল করছ সেই সমস্ত বিষয় তিনি মীমাংসাকারী হিসাবে আসবেন এবং সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে আসবেন। এইভাবে তার মাধ্যমে ইসলাম পূণর্জীবন লাভ করে এবং তাঁর মত্যুর পর ভবিষ্যদ্বণী ছিল রাসূলুল্লাহর 'সুম্মা তাকুনু খিলাফতুন আলা মিন হাজী নবুয়্যা। নবুয়্যাতের পদাঙ্ক অনুসরনে আবার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই খিলাফতের ক্রমধারায় আমরা ৫ম খলীফার যুগে বাস করছি। যার পবিত্র নাম হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)। এইভাবে ইসলামের গতি অব্যহত আছে। তবে যে কোন পর্যায়ে যদি আপনি এক এক পাতা নিয়ে উল্টিয়ে দেখেন মনে হবে কোথায় গেল ঈমান আর কোথায় গেল ইসলাম। এই চাহিদা পূরণ করার জন্যই এই সমস্যাটা নিরসনের জন্যই শেষ যুগে মসীহ এবং মাহদীর আগমনের কথা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মুখ দিয়ে শুনিয়েছিলেন। এবার আমরা তাঁর দিক থেকে আহবান জানাচ্ছি রাসূলের কথা মানেন এবং নিজেদের ঈমানকে তরতাজা করেন।

প্রশ্নঃ আব্দুল মান্নান, ব্রাহ্মনবাড়ীয়াঃ' *লাল মাহদীউ ইল্লাহ ঈসা ইবনে মরিয়ম' এর প্রেক্ষিতে আপনারা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্যতা কীভাবে উল্লেখ করেন।*

মওলানা ফিরোজ আলমঃ ইমাম মাহদী (আ.) যিনি আবির্ভূত হবেন তার আগমনের কিছু লক্ষন হযরত মুহাম্মদ (সা.) বর্ণনা করেছেন এগুলোর পূর্ণতায় তার সত্যতা প্রমানিত হবে। আপনাকে এ বিষয়ে বুঝতে হবে ইমাম মাহদী (আ.)-কে ঈসা ইবনে মরিয়ম নাম দেয়ার কারণ হল সংক্ষেপে বলতে হবে, এটি একটি ভবিষ্যদ্বাণী। ঈসা (আ.) যে অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে এসেছিলেন, ইহুদিদের ভিতর যে রোগ ব্যধি, বালাই পচন দেখা দিয়েছিল। সেই পরিস্থিতির নিরসন বা চিকিৎসার জন্য হযরত ঈসা (আ.) এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের অবস্থা অবিকল তেমনি হয়ে যাবে। আমার উম্মত ইহুদির মতো হয়ে যাবে। এমনকি পচন গলন আর নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে আরও এক কদম এগিয়ে থাকবে। একইভাবে এই উম্মতে যে ব্যধি দেখা দেয়ার কথা সেই ব্যধি যেহেতু ইহুদীদের ব্যধির সাথে সাদৃশ্য রাখবে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এই চিকিৎসারে নাম রেখেছেন ঈসা ইবনে মরিয়ম এবং হাদীসে বলেছেন, তোমরা ভুল করো না, ঈসা ইবনে মরিয়মই মাহদী হবেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সেই ব্যক্তি হবার দাবী করেছেন, পরিস্থিতি তাই, যা রাসূল (সা.) বলেছেন এ অবস্থায় মাহদীর উপস্থিতি আবশ্যক তাই আল্লাহ তালা আমাকে পাঠিয়েছেন।

প্রশ্নঃ আব্দুল মান্নান, ব্রাহ্মনবাড়ীয়াঃ *হযরত নবী করীম (সা.)-এর সময়ে বয়আত হওয়ার ব্যাপারে অনেক শর্ত ছিল কিনা, বর্তমানে আমরা দেখতে পাই আপনাদের সম্প্রদায়ে যদি বয়আত হতে হয় তাহলে ১০টি শর্ত মেনে বয়আত করতে হয়। এই বিষয়ে অনুগ্রহ করে একটু বিস্তারিত বলুন।*

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ বয়আতের ১০টি শর্ত হচ্ছে ইসলামের সারাংশ, ইসলামের বইরের কোন কথা এর মধ্যে নাই। আর ইসলামের কোন শিক্ষা এ থেকে বাদ দেয়া হয় নাই । এটাও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর লেখনী সম্রাট হওয়ার একটি প্রমান। অদ্ভুতভাবে ১০টি শর্তের মাঝে তিনি ইসলামের শিক্ষা একত্র করে দেখিয়ে গেছেন। আমি আপনাকে একটা ঘটনা বলে শেষ করছি। আমাদের ঘোর বিরোধীতা হয় পাকিস্তান নামে রাষ্ট্রে সেখানে একজন বলেছিল যে আহমদী হয় সে কাফের হয়ে যায়। একজন সাংবাদিক সে বলল, দেখি তো কী শর্তে আহমদী হতে হয়। সে ১০টি শর্ত সম্বলিত বয়আত ফরম নিয়ে যায় পরদিন এসে বলে, দেখ তুমি বলছিলে, যে এই ১০টি শর্ত পালন করে সে কাফের হয়ে যায় কিন্তু আমি পড়ে দেখলাম, যে এই ১০ শর্ত পালন করে সে ওলি আল্লাহ হয়ে যায়। আপনি নিজে পড়ে দেখুন এতে কোন ইসলামী শিক্ষা বাদ দেয়া হয়েছে কিনা আর কোন বাড়তি কথা এতে সংযোজিত হয়েছে কিনা। কি শর্ত মানতে হবে? ১৬ আনা ইসলামকে মানতে হবে। এটাই ইমাম মাহদী (আ.) এর প্রদত্ত শর্ত যদি বয়আত কর তাহলে এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে দেখাও। অন্যান্যরাও এমন দাবী করতে পারে কিন্তু এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ আপনার কাছে জীবন্ত ঐশী শিক্ষক না থাকে।

মওলানা ফিরোজ আলমঃ উনি মনে হয় এটি জানতে চেয়েছেন রাসূলুল্লাহ যখন বয়আত নিতেন এ ধরনের কোন শর্ত ছিল কিনা। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে তিনি বয়আতের শর্ত উল্লেখ করতেন এবং মানুষকে বলতেন আমার সাথে বল, এই কথাগুলো মেনে চলবে।

.প্রশ্নঃ ওসমান গনী, ঢাকাঃ *দাজ্জালের আগমনের পূর্বে কোরআনের বরকত উঠে যাবে অথচ বর্তমানেও তো কুরআনের বরকত রয়েছে এক্ষেত্রে আপনাদের বক্তব্য কী?*

মওলানা ফিরোজ আলমঃ কুরআনের বরকত তো ঠিকই আছে, কিন্তু আপনি যা বলেছেন তার অর্থ হলো কুরআনের বরকত মানুষের হৃদয় থেকে উঠে যাবে। মানুষ কুরআনী শিক্ষায় আমল করবে না। এটি রাসূল (সা.) বলেছেন, কুরআন অনেক সুন্দর সুন্দর অক্ষরে ছাপায় ছাপা হবে কিন্তু এর উপর আমল হবে না আর এটি আক্ষরিক অর্থে ঘটেছে। মুসলমানদের বড় বড় আলেমরা লিখেছে কুরআন এখন শুধু মুসলমানদের গলা পর্যন্ত সীমিত। সুন্দর সুন্দর সুরে কুরআন পড়া হচ্ছে কিন্তু কুরআন গলার নিচে আর নামে না। অর্থাৎ হৃদয়ে এর প্রভাব নেই। এটি আহমদীয়া মুসলিম জামাত বলছে না। উপমহাদেশের বড় বড় আলেমরা নিজেদের কবিতায় এগুলো লিখেছেন। এটি পুর্ণ হয়েছে আক্ষরিক ভাবে।

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ ওয়ালা ইয়াবকা মিনাল কুরআনে ইল্লা রাসমূহু। কুরআন কেবল অক্ষর সর্বস্ব রয়ে যাবে। ভিতরে সার থাকবে না। কুরআন আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয়, কী বলতে চায়, কী বানাতে চায়, মানুষ অনুধাবন করবে না। তারা দেখবে উচ্চারণটা সঠিক হচ্ছে কিনা। উচ্চারণ সর্বস্ব কুরআন দিয়ে আমরা কিছু করতে পারব না। যে কুরআন মানুষকে মানুষ বানিয়েছিল সোনার মানুষ বানিয়ে ছিল কেবল সোনার মানুষ বানায়নি খোদার দর্পন- রূপ মানুষ বানিয়েছিল। সে কুরআন আমাদের কাছে আবার ফেরত দেবার জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এসেছেন। আপনার মনে আছে হযরত উমর (রা.) তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, কারো কাছে বশ মানতেন না। কিন্তু বশ মেনেছিলেন কুরআনের কাছে তার বোনের বাসায় সুরা ত্বহার প্রথম দিকের আয়াত শুনে। তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন যে, এটা মুহাম্মদের শিক্ষা? এটাতো অদ্ভুত বাণী, এটা জাগতিক হতে পারে না, এটা স্বর্গীয় বাণী। তিনি কেন এটা বলেছিলেন? উচ্চারণ শুনে বলেন নাই বরং এর যে বক্তব্য সেটা তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছিল। এই কুরআনকে জীবন্ত করার জন্যই হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) এসেছেন। আপনাকে স্বাগত জানাই। যখন আপনি আমাদের সাথে মিশবেন এই বিষয়টি আপনি নিশ্চয় অনুভব করবেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৮৭তম সালানা জলসা কার্যক্রমে হঠাৎ নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

গত ৮/০২/২০১১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন

প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা,
আস্‌সালামু আলাইকুম।

আজ আবারও এক বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমাদের জরুরী আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ায় আমরা শুরুতেই আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আপনারা অবগত আছেন, প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আমরা আমাদের বার্ষিক সম্মেলন বা জলসা সালানার আয়োজন করে থাকি। ৩ দিনের এই জলসায় বছরে একবার আমাদের সারা দেশ থেকে আগত সদস্যরা একত্রিত হন, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষায় নিজেদের উজ্জীবিত করেন, দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের উৎসর্গ করার ব্রত গ্রহণ করেন, নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের দিকনির্দেশনা নিয়ে থাকেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য শান্তির ধর্ম ইসলাম ও তার মহান রাসূল (সা.) এর শিক্ষা প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া। নোংরা রাজনীতির সাথে আমাদের কোনরূপ সম্পর্ক নাই, বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসবাদ থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত। সারা বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নিজ নিজ দেশের প্রতি অনুগত, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায় হিসাবে সুপরিচিত।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও আমরা আমাদের বার্ষিক সম্মেলন ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বকশী বাজারে আমাদের এই প্রাঙ্গন জলসার আয়োজনের জন্য অপ্রতুল হয়ে পড়ায় বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমরা একটি বিকল্প জায়গার সন্ধান করছিলাম। অবশেষে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আমাদের এবারকার সম্মেলন যা আমাদের ৮৭তম জলসা সালানা, গাজীপুরের বাহাদুরপুরে অবস্থিত রোভার স্কাউট ট্রেনিং কেন্দ্রে আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং সেজন্য সম্মেলনের জন্য নির্ধারিত তারিখের প্রায় এক মাস আগে জেলা প্রশাসকের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি, সে মোতাবেক যথাযথ তদন্তের পর গত ২৪ জানুয়ারী, ২০১১ গাজীপুর জেলা প্রশাসন আমাদের জলসা অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করেন। এ ছাড়া স্থানীয় সংসদ সদস্য ছাড়াও উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের সাথেও আমরা যোগাযোগ স্থাপন করি ও জলসায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের আমন্ত্রণ জানাই। এছাড়া ঢাকা থেকেও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অনেকে যোগদানের আশা ব্যক্ত করেন। এলাকাটি তুলনামুলকভাবে স্বল্প ও হালকা বসতিপূর্ণ ও মোটামুটিভাবে Isolated হওয়ায় স্থানটিকে আমাদের জলসা অনুষ্ঠানের জন্য একটি উপযুক্ত স্থান বলে আমরা বিবেচনা করি।

সে অনুযায়ী জলসা অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয় এবং সম্মেলনের দিন ৬ ফেব্রুয়ারী সকালের মধ্যে সারা দেশ থেকে ৮০০০ (আট হাজার) এর অধিক সদস্য এসে সম্মেলন স্থানে উপস্থিত হন। আর প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) সদস্য সম্মেলন স্থলের উদ্দেশ্যে পথে থাকেন। তাছাড়া সম্মেলনস্থলে তখন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিরিয়া, ইটালী, ভারত ও পাকিস্তান থেকে আগত প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন স্থলে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক আবাসন ব্যবস্থা ছাড়াও দুটি সম্মেলন মার্কি, খাবার ও পয়ঃব্যবস্থা, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সুসম্পন্ন করা হয়। এমনি সময়, বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় একজন এসিষ্ট্যান্ট এস.পি'র নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনীর একটি দল এসে আমাদের জানায় যে, প্রশাসন ইতিপূর্বে প্রদত্ত তাদের অনুমতি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং আপনাদেরকে জলসা না করে অতি সত্ত্বর এ স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাদের ভাষায় "স্থানীয় জনগণের" আপত্তির কারণে নাকি তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও আমরা নিজেরা এই ধরনের কোন আলামত দেখতে পাইনি, বরং আগের দিন গভীর রাত পর্যন্ত আশেপাশের লোকজন আমাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা বলেন এবং একজন ইউনিয়ন সদস্য দীর্ঘক্ষণ আমাদের সাথে অবস্থান করেন। অতএব, পুলিশ কর্তৃক বর্ণিত "স্থানীয় জনগণের আপত্তির" সাথে আমরা বাস্তবতার কোন মিল পাইনি।

যাই হোক, আমরা প্রশাসনকে আমাদের অবস্থা বুঝানোর চেষ্টা করি, আমরা বলি এটা আমাদের নাগরিক অধিকার, আমরা আমাদের লোকদের নিয়ে অনুষ্ঠান করছি তাও আবার একটি নির্জন স্থানে, বলতে গেলে জঙ্গলের ভেতরে। ইতিমধ্যে নারী-পুরুষ-শিশু সহ প্রায় ৮০০০ (আট হাজার) লোকের সমাগম হয়েছে, অনেক লোক পথে রয়েছে যারা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছে এবং আসছে,

সংবাদ সম্মেলনে আগত সাংবাদিকদের একাংশ

এর জন্য আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে ও ব্যাপক শ্রম ও আর্থিক ব্যয় করতে হয়েছে, এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে জলসা বন্ধ করা দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া এটি আমাদের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে নিজেদের নিয়ে আলোচনা করবো, কারো যেন অসুবিধা না হয় সেজন্য জঙ্গলের ভিতরে নির্জন স্থান আমরা বেছে নিয়েছি। আট হাজার লোককে স্বল্প সময়ে সরিয়ে নেয়াও কঠিন ব্যাপার, দূরের লোকজন বাস ভাড়া করে এসেছেন, বাস তাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে, ৩ দিন পর আবার এসে নিয়ে যাবে, ইত্যাদি সবদিক বিবেচনা করে আমাদের অনুষ্ঠান বহাল রাখার অনুমতি দেয়া হোক। এ বিষয়ে আমরা প্রশাসনের উর্দ্ধতন মহলেও যোগাযোগ করি। কিন্তু কোনকিছুতেই কোন ফল হয়নি। সারাদিনের দেন-দরবারের পর অবশেষে শুধুমাত্র আমাদের খলিফা হুযুরের বক্তৃতা যেটি তিনি লন্ডন থেকে আমাদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেল MTA এর মাধ্যমে প্রদান করেন সেটি শুনে বিকেল ৫.৩০ টার মধ্যেই স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। আমরা আহমদীরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাই শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এই অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হই।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ! রাষ্ট্র তথা প্রশাসনের পবিত্র দায়িত্ব ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করা। আমাদের সংবিধান আমাদেরকে আমাদের ধর্মকর্মকরণ ও পালনের অধিকার প্রদান করেছে। অন্যের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, অথবা তথাকথিত উগ্র মৌলবাদীদের "ধর্মীয় অনুভূতিতে" যাতে "আঘাত" না লাগে তা বিবেচনা করে ঢাকা মহানগরীর কোন উন্মুক্ত স্থানে আমাদের জলসা না করে, শহর থেকে দূরে প্রায় নির্জন একটি স্থানে আমরা আমাদের জলসার আয়োজন করি। কিন্তু এতেও উগ্র মৌলবাদীরা ক্ষান্ত হয়নি। প্রশাসন মুষ্টিমেয় কতিপয় মৌলবাদীর কাছে আত্মসমর্পণ করলো।

অতীতে যাই হয়ে থাকুক, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দাবীদার সরকার বা তার কোন প্রশাসনের কাছ থেকে এ ধরনের আচরণ আমরা কোনভাবেই আশা করিনি। সরকার যেখানে '৭২ এর সংবিধান পুন:প্রতিষ্ঠা করতে ওয়াদাবদ্ধ সেখানে মুষ্টিমেয় ক'জন মৌলবাদীর অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক হুমকীর কাছে এ ধরনের আত্মসমর্পণ একদিকে যেমন সরকারের দুর্বলতার পরিচায়ক, অপরদিকে '৭২ এর সংবিধানের পুন:প্রতিষ্ঠাসহ মুক্তিযোদ্ধের চেতনার বাস্তবায়নে সরকার কতখানি সফল হবে তা' নিয়েও এখন সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ! আমাদের দেশের জনগণ ঐতিহ্যগতভাবেই অসাম্প্রদায়িক ও পরমতসহিষ্ণু। তারা কখনোই মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে নিকট অতীতেও আমরা তার প্রমাণ দেখেছি। অপরদিকে, মৌলবাদীরা যে মূলত: দুর্বল, আর সরকার চাইলেই এদের যে কোন কর্মকান্ডকে প্রতিহত করতে সক্ষম তার অসংখ্য নজির আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি। তাই একটি দুর্বল ও মুষ্টিমেয় কতিপয় মৌলবাদীর কাছে এ ধরনের আত্মসমর্পণ একদিকে যেমন বর্তমান সরকারের ও দেশের ভাবমূর্তি বিশেষ করে নষ্ট করছে অপরদিকে এই ঘটনা অগণতান্ত্রিক, মৌলবাদী ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে উৎসাহিত করবে বলেও আমরা আশংকা করছি, যা কোনভাবেই এদেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না।

আমরা আরও মনে করি, গাজীপুরের প্রশাসন সঠিক চিত্রকে তুলে না ধরে একটি দুর্বল দাবীকে অতিরঞ্জিত করে সরকারের উর্দ্ধতন মহলসহ সবার কাছে পেশ করেছেন, জানি না এর পেছনে কোন অশুভ শক্তির হাত রয়েছে কি না।

অতএব, আমরা আশা করবো সরকার বিষয়টি তলিয়ে দেখবেন। আর ভবিষ্যতে যাতে কারোর বেলায়ই এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার নিশ্চয়তা বিধান করবেন। আমাদের সবার মনে রাখা উচিত যে, উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীকে শক্তি মনে করে একবার যদি তাদের কাছে আত্মসর্পন করা হয়, তাহলে এর পরিণাম যে কিরূপ মারাত্মক আকার ধারন করে আমাদের উপমহাদেশের একটি দেশই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আমরা আশা করবো আমাদের সরকার ও জনগণ অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

সবশেষে, আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এখানে আসার জন্য আমরা আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা এটাও আশা করবো যে, অতীতের ন্যায় বাংলাদেশের মিডিয়া ও সুশীল সমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের চিরায়ত অবস্থান পুন:প্রদর্শন করবেন, সকল অন্যায়কে প্রতিহত করতে জাতির বিবেককে সদা জাগ্রত রাখতে যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন।

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

বিনীত,
আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষে–
মীর মোবাশ্বের আলী
নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও
সম্মেলন আয়োজক কমিটির প্রধান।

৮৭তম জলসা সালানা বিঘ্নিত হওয়ায় বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কিছু

The Daily Star

DHAKA MONDAY FEBRUARY 7, 2011

Bigots foil Ahmadiyya convention

STAR REPORT

In the wake of protests from religious bigots, Gazipur district administration yesterday prevented the 87th annual convention of Ahmadiyya Muslim Jamaat slapping section-144 in and around the venue.

Armed police were deployed at Bahadurpur Scout Training Camp where over 8,000 followers

SEE PAGE 19 COL 5

Bigots foil

FROM PAGE 20

of Ahmadiyya Muslim Jamaat gathered for the three-day annual convention.

Many of them broke down in tears hearing that they had to leave without taking part.

"Our democratic rights have been taken away due to threats from some madrasa people," said Mir Mobasher Ali, a member of the convention organising committee.

"But we are respectful to the law, so we have accepted the government's order," he said.

According to Mizanur Rahman, additional superintendent of police Gazipur, a group of disgruntled locals presented a memorandum to the district administration yesterday demanding that the permit for the convention be revoked.

The SP said Mawlana Mostafa, Mawlana Sharfuddin and Mufti Ataur Rahman were present amongothers.

The district administration revoked the permit. And when violence was imminent, the authorities decided to impose section-144 in two square kilometres surrounding the venue, he said.

Section-144 does not allow any kind of public gathering.

Thousands of people were stuck inside the venue after the declaration of section-144, Ahmadiyya Muslim Jamaat leaders said.

Over 3,000 people coming from different parts of the country also had to return, they added.

According to Ahmadiyya Muslim Jamaat leaders, they rented Bahadurpur Scout Training Camp for three days. The location was picked since it was away from locality so problems with local religious bigots could be averted, they said.

The programme, usually held at their national headquarters in Bakshibazar, was moved to Gazipur to accommodate more people.

For over a decade, followers of Ahmadiyya Muslim Jamaat have been facing abuse and aggression of religious bigots across the country. Many of their houses have been looted from time to time and some have even been killed.

যুগান্তর

সোমবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

গাজীপুরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জলসায় ১৪৪ ধারা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তিন দিনব্যাপী ৮৭তম জলসা স্থগিতের গাজীপুরের প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে। স্থানীয় মৌলিবাদী জনতা, মুফতি এবং এলাকাবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসন এ ব্যবস্থা নেয়। বুধবার থেকে বাহাদুরপুর স্কাউট ট্রেনিং ক্যাম্প এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও আনসার পুলিশ মোতায়েন করা হয়। রোববার সকালে গাজীপুরের ওলামা আলেমসহ ৩ মৌলিবাদী জনতা একটি বিক্ষোভ মিছিল সহকারে গাজীপুরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যান। সেখানে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অনুষ্ঠানের অনুমোদন বাতিলের জন্য দাবি জানান এবং স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ সময় জনতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণপুর মাদ্রাসার মোহাদ্দিস মাওলানা মোস্তফা, মাওলানা শারফুদ্দিন, মুফতি আতাউর রহমান, মুফতি নূরুল ইসলাম, মুফতি আবু সাহান ও মাওলানা মুনাজির মোমেন। জেলা প্রশাসক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। জলসা আয়োজক কমিটির কার্যকরী সদস্য মীর মোবাশ্বের আলী জানান, 'আমাদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। কিছু মোল্লাদের হুমকিতে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলেই সরকারি আদেশ মেনে নিয়েছি।' তিনি জানান, তিনদিনের জলসায় ৮ হাজার লোক যোগদান করার কথা ছিল।

জনকণ্ঠ

ঢাকা, সোমবার, ২৪ মাঘ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

গাজীপুরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জলসা স্থগিত

প্রথম আলো

সোমবার, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

গাজীপুরে আহমদিয়া জামাতের জলসার অনুমতি বাতিল

১৪৪ ধারা জারি

গাজীপুর প্রতিনিধি ●

গাজীপুরে আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের তিন দিনব্যাপী ৮৭তম জলসার অনুমতি বাতিল এবং জলসাস্থল ও এর আশপাশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রোববার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। গতকাল বিকেলে বাহাদুরপুরের রোভার পার্ক স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্র চত্বরে এই জলসা শুরু হওয়ার কথা ছিল।

গতকাল সকালে এলাকাবাসী একটি বিক্ষোভ মিছিলসহ গাজীপুরের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যান। তাঁরা আহমদিয়া মুসলিম জামাতের জলসার অনুমতি বাতিলের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন। এ সময় জনতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মোস্তফা, মাওলানা শারফুদ্দিন, মুফতি আতাউর রহমান, মুফতি মোল্লা আ. সাত্তার। জেলা প্রশাসক সব দিক বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

পরে পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় আহমদিয়া মুসলিম জামাতের অনুষ্ঠানের অনুমতি বাতিল ও অনুষ্ঠান এলাকায় দুই বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

জলসা আয়োজক কমিটির সদস্য মীর মোবাশ্বের আলী জানান, 'কিছু ব্যক্তির হুমকিতে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাই সরকারি আদেশ মেনে নিয়েছি।' তিনি জানান, তিন দিনের জলসায় আট হাজার লোকের সমাগম হওয়ার কথা ছিল।

গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান বলেন, বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী গতকাল সকালে জেলা প্রশাসকের কাছে জলসা বন্ধের আবেদন জানালে প্রশাসন জলসার অনুমতিপত্র বাতিল করে প্রথমে অনুষ্ঠান স্থগিতের নির্দেশ দেয়। পরে জলসাকে ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ওই এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। তিনি জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
ঢাকা ॥ বুধবার
২৭ মাঘ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

(১৯ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

জামায়াতের বিচার দাবি

আহমদীয়া জলসা বন্ধ করে সরকার সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নির্বাহী সভাপতি সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির বলেছেন, জামায়াতে ইসলামীর চাপের মুখে সম্প্রতি গাজীপুরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জলসা বন্ধ করে দিয়ে সরকার সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়েছে। তিনি বলেন, মৌলবাদীদের সঙ্গে আঁতাত করা সরকারের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, পাকিস্তান সরকার মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দিয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। শাহরিয়ার কবির

(১৯ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

আহমদীয়া

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

বলেন, নিজ ধর্ম পালন করা প্রত্যেক ধর্মের মানুষের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার। জামায়াতে ইসলামী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা দিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। এজন্য জামায়াত নেতাদের বিচারের দাবি করেন তিনি। মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির ও সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক বীর মোবাশ্বের আলী। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবী এডভোকেট মুজিবুর রহমান বাচ্চালী, মেজর জেনারেল অব এএম মাহমুদুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার মুসারি ইমলিবী, রহমান আব্দুল আলিম, সমাজকর্মী রেহানা চৌধুরী, আহমদ তাজউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

শাহরিয়ার কবির অভিযোগ করেন, যারা আহমদীয়া জামাতের জলসায় বাধা দিয়েছে সরকারের উচিত ছিল বাধাদানকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া। অথচ ঘটনা ঘটেছে উল্টো। জামায়াতে ইসলামীকে রক্ষা করতে সরকারের প্রশাসন এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন তিনি। অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করারও দাবি করেন শাহরিয়ার কবির।

লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক বীর মোবাশ্বের আলী বলেন, সরকার যেখানে '৭২ সালের সংবিধান পুনর্প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর, সেখানে জামায়াতে ইসলামীর মতো দলের ধারাবাহিক মৌলবাদীর অসৌজন্যিক ও অসাংবিধানিক দুষ্কৃতির কাছে নত শিকার করে সম্মেলন বন্ধ করে দেয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। এ ধরনের ঘটনা বিশ্বদরবারে যেমন সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে, অন্যদিকে অগণতান্ত্রিক মৌলবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তিকে উৎসাহিত করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। নিজেদের অবস্থান তুলে ধরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এই নেতা বলেন, নেতারা রাজনীতির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসবাদমুক্ত আদর্শ চর্চা করেন তারা। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সকল দেশে আহমদীয়া জামাত নিজ নিজ দেশের প্রতি অনুগত ও দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গাজীপুরের ঘটনা তুলে ধরে তিনি বলেন, গত এলাকার জেলা প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে গাজীপুরের বাহাদুরপুর রোভার স্কাউট ট্রেনিং সেন্টারে ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি তারা ৮৭তম জলসা প্রস্তুতি নেয়। এমন সময় জলসা শুরুর আগের রাত তাদের বরাদ্দ বাতিল করে জেলা প্রশাসক। স্থানীয় লোকজনের আপত্তির কারণে বাতিল করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসক জানান। জেলা প্রশাসকের এমন আপত্তিকে ভিত্তিহীন উল্লেখ করে এই আহমদীয়া নেতা সংবাদ সম্মেলনে বলেন, স্থানীয় লোকজনের কোন আপত্তি ছিল না। আপত্তি করে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা। এই ঘটনায় অভিযোগের তদন্ত করে শাস্তি দেয়ার দাবি করেন তিনি।

The Daily Star
DHAKA WEDNESDAY FEBRUARY 9, 2011

BAR TO CONVENTION

Ahmadiyyas demand probe

STAFF CORRESPONDENT

Ahmadiyya Muslim Jamaat Bangladesh yesterday called for an investigation into the reasons that prevented the religious community from holding its annual convention in Gazipur.

The district administration of Gazipur on Saturday prevented the annual convention of the organisation, and slapped section144 in and around the venue in the wake of protests from religious bigots.

The Ahmadiyya leaders suspect that the move was a result of threats from local fundamentalists in Gazipur.

The demand came at a press conference at the office of Ahmadiyya Muslim Jam'aat Bangladesh in Bakshibazar in the city yesterday.

The Ahmadiyya community leaders said they rented Bahadurpur Scout Training Camp to avoid problems with local religious bigots.

দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা: বুধবার ২৭ মাঘ ১৪১৭
Wednesday 09 February 2011

জলসায় ১৪৪ ধারা জারি করায় সরকারের প্রতি আহমদীয়া মুসলিম জামায়াতের ক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক জলসায় ১৪৪ ধারা জারি করায় সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সংগঠনের শীর্ষ নেতারা। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে বকশীবাজারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও চরমপন্থীর জোট সরকারের মতো এখই আচরণ করছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আমীর বীর মোবাশ্বের আলী জানান, সংগঠনের ৮৭তম বার্ষিক জলসা গত ৬-৮ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের রোভার স্কাউট ট্রেনিং কেন্দ্রে আয়োজন করা হয়। কিন্তু স্থানীয় জনগণের বাধার কারণে জেলা প্রশাসক সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করেন।

তিনি বলেন, সংবিধান প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার দিলেও উগ্র মৌলবাদীরা ধর্মীয় মূল্যবোধে নানাভাবে আঘাত দিচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি অবিলম্বে সরকারের কাছ থেকে এ ধরনের মৌলবাদী আচরণ আশা করা যায় না।

সমকাল
বুধবার ২৭ মাঘ ১৪১৭ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১

আহমদিয়াদের সালানা জলসা করতে না দেওয়ার অভিযোগ

■ সমকাল প্রতিবেদক

গাজীপুরে রোভার স্কাউট ট্রেনিং সেন্টারে বার্ষিকীর সমাবেশ করতে না দেওয়ার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ। তারা অভিযোগ করেন, জলসাস্থলে ধর্মান্ধরা বিশ্ব এবার ৮৭তম সালানা জলসা আয়োজন করা হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গাজীপুর জেলা প্রশাসন তাদের সেখানে কোনো অনুষ্ঠান করতে দেয়নি। বকশিবাজারে অবস্থানরত মুসলিম জামাতের (আহমদীয়া) কার্যালয়ে গতকাল বুধবার সংবাদ সম্মেলনে জামাতের আমীর বীর মোবাশ্বের আলী সাংবাদিকদের বলেন, জলসাস্থলে ধর্মান্ধরা বিগত ৬ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংঘর্ষালের প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

Ahmadiyyas barred from holding jalsa salana

United News of Bangladesh
Dhaka

THE Ahmadiyya Muslim Jamaat has expressed deep concern after being prevented from holding its 87th jalsa salana at the Rover Scout Training Centre at Bahadurpur in Gazipur, despite prior permission from the local administration.

The annual convention of the jamaat was scheduled to be held on February 6, 7 and 8 but the Gazipur district administration revoked its previous permission at the last moment, when over

Continued on page 4 Col. 5

প্রথম আলো

বুধবার ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১, ২৭ মাঘ ১৪১৭, ৫ রবিউল আউয়াল ১৪৩২, রেজি. নং ডিএ ১৮৮৩

গাজীপুরের সম্মেলন বন্ধের বিচার দাবি আহমদিয়া জামাতের

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

গাজীপুরের রোভার স্কাউট কেন্দ্রে বার্ষিক সম্মেলন করতে না দেওয়ার ঘটনার বিচার দাবি করেছে আহমদিয়া মুসলিম জামাত। তাঁরা বলেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এমন ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত। দেশের বিশিষ্টজনেরাও এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

ঢাকার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিন দিনের সম্মেলন শেষে গতকাল মঙ্গলবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশিষ্টজনেরা এই দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সাহেবে ন্যাশনাল আমির মীর মোবাশের আলী বলেন, 'আমরা নির্ধারিত সময়ে আবেদন করেছি। প্রশাসন আমাদের অনুমতিও দিয়েছে। স্থানীয় জনগণ আমাদের সহায়তা করেছে। নির্ধারিত দিনে ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক লোকও সম্মেলনে যোগ দিতে চলে আসেন। কিন্তু কেন, কী কারণে, কাদের হুমকির কারণে, প্রশাসন আমাদের জলসা বন্ধ করে দিল তার বিচার হওয়া দরকার।'

সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় মসজিদ নির্মাণ কমিটির নির্বাহী সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, কয়েকজন জামাতের কর্মীর হুমকিতে স্থানীয় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে এই সম্মেলন বন্ধ করায় আমি ভবন সংলগ্নের ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এমন ঘটনা খুবই লজ্জার। নিজেদের জামাতের জোরে সরকারের সময়ে জামাতের মাধ্যমাধ্যমে আহমদিয়াদের গুপ্ত নির্যাতন করেছে।

জাতীয়তাবাদপন্থী দেশের সোচ্চার সংলাপ, মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কের একটি শক্তি ক্ষমতায়। সবাই আশা করেছিল, জামাতের উৎপাত বন্ধ হবে। কিন্তু মৌলবাদী গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ায় গাজীপুরের রোভার প্রশাসন যা করল, সেটি দুঃখজনক। এই ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহমদিয়া জামাতের নির্বাহী কমিটির সদস্য আহমদ কাদরির চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুজ্জামান, আবদুল আউয়াল খান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত রাহমান আবদুল আলিম, শিরিয়ার মনির ইসলামি ও পাকিস্তানের মুজিবুর রহমান।

এই সম্মেলন বন্ধ করার কারণ হিসেবে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক কামরুন উন্নিসা তালুকদার পত্রকারদের বিভিন্নকে বলেছেন, স্থানীয় পরিস্থিতির কথা জেনেই এই সম্মেলন বন্ধ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সম্মেলনের আগের দিন মাদ্রাসার অনেক শিক্ষকসহ অনেকেই এসে এর বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন, এখানে এই কার্যসূচি হলে অনেক বিশৃঙ্খলা হবে। জলসাস্থলের জানমালের কথা চিন্তা করেই সম্মেলন বাতিল করেছি।

আওয়ামীলীগপন্থী ও জঙ্গিবিরোধী সংগঠনের সহকর্মী উপদেষ্টা সুলতানা কামাল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, শরীফ কামরুজ্জামান অনেকেই সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

NEWAGE

WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2011

Ahmadiyyas barred

Continued from page 1

8,000 members from all over the country had already gathered at the venue.

Briefing reporters at the Ahmadiyya Muslim Jamaat office at Bakshibazar in Dhaka Tuesday afternoon, Meer Mobasher Ali, naib national amir said representatives from the USA, the UK, Syria, Italy, India and Pakistan were also present at the convention ground on February 6.

He said the district police administration asked them to leave the location, saying that they had to take the decision due to objections raised by the 'local population'.

'Our only intention is to convey the message of Islam, the religion of peace, and the teachings of Prophet Muhammad (SA) to all in a peaceful and harmonious manner,' he said, adding, 'We have no connection with dirty politics, and we are absolutely free from any disorder or terrorism.'

Mobasher also said his community was not sure if there was 'any hand of any evil force' behind the episode.

He said being barred from holding the conference was a violation of one of their fundamental rights as granted in the constitution.

'We intend to discuss only our own matters amongst ourselves and for this we have chosen a secluded location in a jungle to ensure the least disturbance to anyone else,' he added.

Naib National amir said it was the pristine responsibility of the state and administration to ensure the fundamental and civil rights of its citizens irrespective of creed, colour and race.

'As Ahmadiyyas are law-abiding citizens, therefore, after listening to the address delivered by our khalifa on our own international television channel MTA from London, we left the compound by 5:30pm,' he said.

Mobasher also said it had been proven 'on innumerable occasions' that fundamentalists were essentially weak, and 'if the government desires', their activities could be tackled.

He bemoaned the 'tame surrender' to a 'weak and tiny' group of fundamentalists, saying it has tarnished the image of the government as well as the nation.

Mobasher also apprehended that the incident would encourage 'undemocratic, fundamentalist, and fascist' elements which could never be of any benefit to this nation.

He hoped that the government would investigate the matter and ensure that this treatment was not repeated against anyone in the future.

daily sun

TRUE & IMPARTIAL

DHAKA | WEDNESDAY | 9 FEBRUARY 2011

Ahmadiyya demands ban on Jamaat

STAFF CORRESPONDENT

Ahmadiyya Muslim, a sect of Islam, urged the government to ban Bangladesh Jamaat-e-Islami prior to trial of the party's top leaders on charge of war crimes.

"As the present Awami League government is restoring the constitution of 1972 following the Supreme Court verdict which cancelled the 5th amendment, it should restore full-fledged secularism by banning Jamaat," said Mir Mobaswir Ali, national ameer of Ahmadiyya Muslim, at a press conference on Tuesday.

He was speaking at the press conference held at Ahmadiyya Mosque at Bakshbazar in the capital to protest the government's act of not allowing the community's annual convention at Bahadurpur Rover Scout Training Centre in Gazipur which was scheduled for February 6-8.

He said the present proliberation government should not have deprived Ahmadiyya of their constitutional right to hold religious convention surrendering to the demand of Jamaat leaders and activists.

৮৭তম জলসা সালানা অনুষ্ঠান বিঘ্নিত হওয়ায় অ-আহমদী বিভিন্ন সংগঠনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৮৭তম জলসা সালানা, সেই উদ্দেশ্যেই আহমদীয়াদের অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে বাস যোগে ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১১ইং দুপুর ১টায় গাজীপুরের মাস্টার বাড়ি পৌঁছাই। কিন্তু সেখানে এমন করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারী করে।

দূর-দূরান্ত থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অনেক নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ জড়ো হয় জলসা গাহে পৌঁছানোর জন্য কিন্তু প্রবেশ করতে না পেরে শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সবাই। আমরা দেখলাম দাঙ্গা পুলিশ সেখানে অবরোধের প্রাচীর তৈরী করে ফেলে। জলসা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অগ্রিম অনুমতি থাকা সত্ত্বেও প্রবেশদ্বারে বাধা দেওয়া হয়।

টুপিধারী বেশ কিছু মৌলভী সাহেব অবুঝের মত হট্টগোল করতে শুরু করে এবং স্থানীয় প্রশাসনকে এবং সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। নিঃসন্দেহে, পুরো বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং লজ্জার। আমরা সাধারণ সচেতন মানুষ ভীষণভাবে মর্মাহত। ধর্মের নামে সেদিন যা হয়েছে তা ধার্মিকের কাজ হতে পারে না।

আমরা এই হীন কান্ড জ্ঞানহীন কর্মকান্ডের প্রতিবাদ জানাই। আসলে প্রতিবাদ জানাবার সঠিক ভাষা আমাদের নেই। আমরা চাই ভবিষ্যতে যেন, এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। কলমের ভাষায় কারও প্রতি ঘৃণা নয়, তাহলেই এই প্রতিবাদ তার স্বার্থকথা খুজে পাবে।

ধন্যবাদান্তে
এস. জি. কিবরিয়া দীপু
পরিচালক
আমাদের পাঠচক্র

আহমদীয়া জামাতের ন্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার রক্ষায় সরকারের অসহায়ত্ব

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী গাজিপুরে অবস্থিত রোভার স্কাউট ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত আহমদীয়া জামাতের একটি সম্মেলন, স্থানীয় মৌলবাদী শক্তির হুমকির মুখে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে পন্ড করে দেয়।

রাষ্ট্র যদি মৌলবাদী শক্তিদের তোয়াজ করে চলে তবে তা রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক নয়, পাকিস্তান এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। আমরা আশা করি বাংলাদেশে বর্তমানে একটি অসম্প্রদায়ীক সরকার বিদ্যমান, এই সরকার প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের সংবিধান কর্তৃক প্রাপ্ত মানবাধিকার প্রদান করতে সক্ষম হবে।

মেরাজ নাজির
আহ্বায়ক
গণসমাজ কেন্দ্রীয় কমিটি

তুমি বল, এ সত্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)।
সুতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে অস্বীকার করুক।

(সূরা ঃ আল কাহ্‌ফ : ৩০)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৮৭তম সালানা জলসা ধর্মপ্রাণ সদস্যদের ব্যাপক কুরবানীর ফলশ্রুতিতে সফলতার সাথে সমাপ্ত

রোভার স্কাউটস ট্রেনিং ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত জলসায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মহান খোদা তাআলার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ৮৭তম সালানা জলসা গত ৬-৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ ঢাকার অদূরে (৪২কি:মি: উত্তরে) গাজীপুরের বাহাদুরপুরস্থ (মাস্টার বাড়ী) রোভার স্কাউটস্ ট্রেনিং ক্যাম্পে ৩দিন ব্যপি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যাক উগ্র-ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের চাপের মুখে প্রশাসন এই জলসার কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। শুধুমাত্র হুযূর (আই.)-এর উদ্বোধনী ভাষণ শ্রবন করার অনুমতি দেয়া হয়।

পূর্ব অনুমতি নেয়া সত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে হঠাৎ নিষেধাজ্ঞা এটা কোন বিবেকবানেরই সহ্য করার কথা নয়। তারপরও আহমদীয়া মুসলিম জামাত যেহেতু আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং কোন ক্ষেত্রেই আইন অমান্যকারী নয় তাই প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকেও মেনে নিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের নিজস্ব স্থানে। আর এখানেই অনুষ্ঠিত হয় জলসার বাকী কার্যক্রম। শত শত মাইল দূর থেকে শত বাধা পেড়িয়ে জলসায় শরীক হওয়ার জন্য ছুটে আসেন হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ।

জলসার সমস্ত আয়োজন শেষ, হাজার হাজার আহমদী সদস্য জলসাগাহে উপস্থিত আর এমন সময় প্রশাসন জলসার কার্যক্রম বন্ধ করে দিচ্ছেন এটা মেনে নেয়া কি কারো পক্ষে সম্ভব হতো? দেখুন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শিক্ষা কতই না উত্তম, তারা সরকারের এমন সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে তারা খোদার কাছে এই দোয়াই করেছে যে, হে খোদা যারা আমাদের এই জলসা করতে দিল না তুমি তাদের বিবেক বুদ্ধি দান করো, তারা যেন প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে পারে।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব যখন ঘোষণা দিলেন, প্রশাসন জলসার নিশেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এই কথা শুনা মাত্র প্রতিটি আহমদীর হৃদয় কেঁদে উঠে। নামাযে যেন কান্নার রোল পড়ে যায়। জলসায় আমার একজন প্রবীণ সাংবাদিক ভাইও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া জামাতের শিক্ষা কত সুন্দর। এতো বিশাল আয়োজনের পর জলসা করতে দিচ্ছে না কিন্তু কোনরূপ বিশৃংখলা নেই। নামাযে যে কান্নার দৃশ্য আমি দেখেছি তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। এমনভাবে সরকারের আনুগত্য করা ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। আমার সামনে কোন এক পিতার আদরের ছোট্ট শিশুটি যখন বাবাকে জিজ্ঞেস করলো বাবা জলসা কেন হবে না? বাবা তার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলানো ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছিলেন না।

সেই দূর্গম পাহাড়ি অঞ্চল রাঙ্গামাটির মাহিল্যা থেকে এশেছিলেন বেশ ক'জন। তারা তিন দিনের পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন জলসায়। জলসা সেখানে করতে দিচ্ছে না শুনে তাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, তারা যেন বাকহীন। আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের কি অসাধারণ ধৈর্য্য, কি আনুগত্য যার তুলনা নেই। শীতের মধ্যে এতো সব কষ্ট পাড়ি দিয়ে তারা জলসায় এসেছিলেন কিন্তু জলসা করতে না পেরে চলে যাচ্ছেন তার পরেও কারো কোন অভিযোগ নেই, রাগ নেই। রাত ১২টা পর্যন্ত এক এক করে গাড়িতে করে বকশি বাজারে এসেছেন সবাই। আহমদী সদস্যদের এই ত্যাগ এই কুরবানি কখনো বিফলে যেতে পারে না। একদিন অবশ্যই আমরা এর সুফল দেখতে পাবো, ইনশাআল্লাহ। জলসার কার্যক্রম দ্বিতীয় দিন থেকে বকশি বাজারে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশে হতে থাকে এবং খুবই সুন্দরভাবে জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণ প্রিয়

রোভার স্কাউটস ট্রেনিং ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত জলসা মঞ্চে বসে
মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুযূর (আই.)-এর ভাষণ শুনছেন

খলীফার বাণী দেখুন কতই না শান্তিপূর্ণ ও ভালোবাসার। তিনি এমন অবস্থায় সকল আহমদীকে দোয়ার প্রতি জোর দেয়ার জন্য আহ্বান করেন। তিনি (আই.) বলেন-

আমি যেমনটা বলেছি, পুলিশ এবং প্রশাসন আমাদেরকে অনুষ্ঠানের জন্য সল্প সময় নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে। আমরা যেন ৫ টার মধ্যে এই অধিবেশন শেষ করি। আমরা আহমদীরা সর্বদা আইনকে মান্য করে থাকি। আর প্রকৃত ইসলাম এটাই আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। ইনশাআল্লাহ তাআলা এই সময়ের মধ্যেই দ্রুততার সাথে এই অধিবেশন শেষ করব, যে অনুষ্ঠান এখন চলছে, কেননা আমি সেভাবেই বলেছি। আমাদের উদ্দেশ্য কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়, বরং শান্তিকামী এবং শান্তি প্রিয় মানুষ আমরা। আর এজন্য আইনের সকল নির্দেশ মান্য করা এবং এর ওপর আমল করা আমাদের দায়িত্ব। এজন্য যে, সে দেশে সবদিক থেকে যেন শান্তি বিরাজমান থাকে।

আমরাতো সেই মহান নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর মান্যকারী, শান্তি প্রতিষ্ঠার খাতিরে যিনি কাফেরদের অযৌক্তিক (একপক্ষ) শর্তকেও গ্রহণ করে নিয়েছিলেন যাতে কোন ধরনের বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। এই স্থানেতো জলসা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তবে জামাতের নিজস্ব যে জায়গা আছে সেখানে সম্ভব হবে আর সেখানেই যেন করা হয়। আর এটি হয়তো সংক্ষিপ্ত পরিসরে চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ তাআলা। পরিপূর্ণভাবে এটি সম্ভব না হলেও লোকেরা যেহেতু এসেছে তাই তারা এতে শামিল হয়ে যাবে। তবে আমাদের ইচ্ছা ছিল প্রশস্ত এই জায়গায় জলসা করে ইসলামের অনুপম সুন্দর বাণী জামাতের পক্ষ থেকে জনগণের কাছে পৌঁছাব। কিন্তু সেই লোকদের দুর্ভাগ্য যে এটা শোনা থেকে তারা বঞ্চিত রয়ে গেল।

প্রথমত আমি এ কথাই বলতে চাই, বাংলাদেশের জলসার এই দিনগুলোতে যারা একত্রিত হয়েছেন তারা নিজেদের সময়কে এবং নিজেরা সর্ব মুহূর্তে দোয়ায় রত থাকুন। আর সমস্ত দুনিয়ার আহমদীরাও তাদের জন্য দোয়া করুন। ইনশাআল্লাহ তাআলা আমাদের দোয়ার মাধ্যমে একদিন অবশ্যই পরিবর্তন আসবে আর বিরোধীতার আধিক্য ক্ষীণ মাত্রায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু এই আধিক্যকে কমিয়ে দিতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যা নির্দেশ দিয়েছেন তার উপর আমল করা জরুরী। আর তা হচ্ছে আল্লাহর দিকে আহবান করার কাজ। অবস্থা যাই হোকনা কেন, এই কাজ আমাদের সর্বাবস্থায় করে যেতে হবে। আর ইনশাআল্লাহ তাআলা কখনো তা পরিত্যাগও করা যাবে না। এর পর হুযূর (আই.) দোয়া করান।

হুযূর (আই.)-এর নির্দেশানুযায়ী জলসার দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে খোলা মাঠে মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঢাকার সভাপতিত্বে। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মশিউর রহমান।

নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ এনামুর রহমান। বক্তৃতা পর্বে **'রাসূল (সা.) প্রেমে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)'** এ বিষয়ে

দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত জলসায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

তিনি তার বক্তৃতার একাংশে বলেন, বর্তমান যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) একজন ফানা ফিল্লাহ্ ও ফানা ফির রাসূল ব্যক্তি। হযরত মির্যা সাহেব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে বিভোর থাকতেন। বাল্যকাল থেকে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রেমে নিমজ্জিত ছিলেন। রাত-দিন তিনি নামায পড়তেন, যিকরে ইলাহি করতেন, দরূদ শরীফ পড়তেন, অথবা কুরআন মজীদ পাঠে রত থাকতেন। তাঁর পিতা তাকে সাংসারিক কাজে মনোযোগী করার চেষ্টা করে ব্যার্থ হয়েছেন। হযরত মির্যা সাহেব কোন ভাবেই নিজকে ইহজাগতিক বা সাংসারিক কাজে মনোযোগী করতে পারেন নি।

হযরত মিয়া ফতেহ দীন বর্ণনা করেছেন, আমি মাঝে মাঝে কাদিয়ানে হযরত মির্যা সাহেবের নিকট আসতাম। কখনও কখনও রাতেও হযরত মির্যা সাহেবের কাছে থেকে যেতাম। একবার গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম হযরত মির্যা সাহেব খুবই অস্থির। ঘুমাতে পারছেন না। তাঁর অবস্থা এমন ছিল, তাজা মাছ ডাংগায় তুলে ছেড়ে দিলে যেমন হয়। আমি চুপ করে থাকলাম।

সকালে মির্যা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাতে কেন এমন অস্থির ছিলেন? মির্যা সাহেব বললেন, যখনই আমার মনে পড়ে যায় যে, আজ ইসলামের কি অবস্থা? খৃষ্টান, হিন্দু সবাই ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমন করছে। ইসলামের পক্ষে কথা বলার কোন লোক নাই। তখন আমি সহ্য করতে পারি না। (সিরাতুল মাহ্‌দী, ৪র্থ খন্ড)

এরপর **'বিয়ে-শাদীতে ও সামাজিক কদাচার পরিহারে আমাদের করণীয়'** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব কাওসার আলী মোল্লা, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় বিয়ে-শাদীতে সামাজিক কদাচার পরিহার এবং এসব সামাজিক কদাচার যে ইসলাম বিরোধী সেই সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে তুলে ধরেন আর সকলকে এসব থেকে দূরে থাকার জন্য আহ্বান জানান।

এরপর **'বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আহমদী তরুনদের কর্তব্য'** প্রসঙ্গে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. তারেক সাইফুল ইসলাম, সাবেক নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত জলসায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জলসার এই পর্যায়ে একটি নযম পাঠ করেন জনাব শাহজাদা খান।

এরপর বক্তব্য রাখেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব।

জলসার দ্বিতীয় দিনের

তৃতীয় অধিবেশন জনাব মেজর জেনারেল (অব.)মাহমুদুজ্জামান, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে বিকাল ৩টায় শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, হাফেজ মৌলবী আবুল খায়ের। নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান।

বক্তৃতা পর্বে **'মানবতার প্রতি মহানবী (সা.) এর অনুগ্রহ'** বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি হযরত রাসূল করীম (সা.) অতুলনীয় শান, মর্যাদা এবং মানবতার জন্য তাঁর হৃদয় কত ব্যাকুল ছিল তা খাতামান্নবীঈন ও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর আলোকে তুলে ধরেন।

এরপর **'হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সূচীত আধ্যাত্মিক বিপ্লব'** প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি তার ব্যক্তিতায় বলেন, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী মুসলমানদের অধপতিত দূর্দশাগ্রস্থ হবার ইতিহাস, এ সময়ে বড় বড় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ, মধ্যপ্রাচ্য উসমানী রাজত্ব ও ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্ব মৃত্যুর প্রহর গুণছিল। মুসলমান রাষ্ট্রগুলো পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এ ছাড়াও অন্তর্দ্বন্দ্ব গৃহযুদ্ধে তারা নিজেদের রক্ত ঝড়াচ্ছিল। খৃষ্টান পাদ্রীরা নিজেদের কল্পিত খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় কোমর বেধে নেমে পড়েছিল। খৃষ্টান পাদ্রী বিশপ এ স্বপ্নে বিভোর ছিল যে সেদিন দূরে নয় যখন ক্রুশের রাজত্ব খানা কাবাকে নিজের অধিনস্ত করে নিবে। তাদের এ স্বপ্ন পূর্ণতা লাভের দ্বার প্রান্তে ছিল। ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে হাজার হাজার বরং লাখ লাখ

জলসায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মেহমানদের
মেহমানদারীর জন্য রোভার স্কাউটস ট্রেনিং ক্যাম্পের পাকশালায় ব্যস্ত কর্মী।

মুসলমান মুহাম্মদ আরবী (সা.) এর পবিত্র কলেমা তৌহীদ পরিত্যাগ করে যিশু খোদার নামের মালা জপতে শুরু করেছিলো। মৌলভী এমাদুদ্দীন, পাদ্রী এমাদুদ্দীন এবং মৌলবী আব্দুল্লাহ্, আব্দুল্লাহ্ আথম হয়ে গিয়েছিল। হাফেযে কুরআন বাইবেলের অনুসারী হতে লাগলো। খৃষ্টানরা তাদের সুমহান বিজয় দেখার নেশায় মত্ত ছিল। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাও প্রচন্ড শক্তির সাথে মুসলমানদের ওপর হামলা করল। কোটি দেবতার পূজারী এক খোদার ওপর বিশ্বাসীদের ওপর যুক্তি ও দর্শনের মাধ্যমে বিজয় লাভ করছিল। 'আর্য সমাজ' এর মত আন্দোলনের ধারা চলতে লাগলো যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের শুদ্ধ করে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে নেয়া। তাদের দর্শন দ্বারা তারা মুসলমান আলেমদের পরাভূত করছিল, মুসলমান আলেম সমাজ ও সাধারণ মুসলমানরা এসব ধর্মের সামনে নিরুপায় হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো এবং তাতেই স্বস্তিবোধ করছিলো। মুসলমান আলেম সমাজ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তকলহে লিপ্ত হয়ে ইসলামের শত্রুদের জন্য মাঠ ফাঁকা করে দিল। তারা কাক হালাল না হারাম, শালওয়ার টাকনুর নীচে না উপরে, বিবি তালাকের ফতওয়া এমন বিষয়াদিতে মত্ত হয়ে ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছিল। না কুরআন শিক্ষা, না কুরআনের উপর আমল, ঠিক এমন সময় আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)কে ইসলামের হারানো গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

জলাসার এ পর্যায়ে নযম পাঠ করেন জনাব খালিদ হোসেন।

এরপর **'ঐশী জামা'তের বিরোধীতা একটি চিরন্তন নিয়ম'** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন পাকিস্তান থেকে আগত জনাব এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান। তিনি তার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের আলোকে স্পষ্ট করেন যে, এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের উপর চরম বিরোধিতা হয়েছে আর সবচেয়ে বেশী বিরোধিতা হয়েছে আমাদের শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর উপর। তদ্রুপভাবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত তাই তাঁর জামা'তের বিরোধিতাও একটি সত্যতারই নিদর্শন।

এই বক্তৃতার পর আমন্ত্রিত অতিথি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। প্রথমে সুদূর সিরিয়া থেকে আগত জনাব মুনির ইদুলবি বক্তব্য রাখেন, তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন, আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যমন্ডিত মনে করছি এজন্য যে, সুদূর দামেস্ক সিরিয়া থেকে এসে আপনাদের সাথে মিলিত হতে পেরে। আমি আপনাদের চেহারায় সূর্যের চেয়েও বেশী কিরণ ও আলো দেখতে পাচ্ছি। আমার জন্য এটা বড় পাওয়া যে, আমি সিরিয়া থেকে আপনাদের দেখতে আসতে পেরেছি। এরপর যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত ব্রাদার আব্দুল আলীম, সেক্রেটারী তবলীগ, কেলিফোর্নিয়া জামাত, তিনি তার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

জলসার ৩য় দিনের চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় ৮ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টায় মোহাম্মদ নজিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সৈয়দপুর-এর সভাপতিত্বে। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মওলানা শেখ শরীফ আহমদ। নযম পাঠ করেন জনাব জাকির হোসেন।

বক্তৃতা পর্বে **'নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী শিক্ষা'** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় নৈতিক

প্রদর্শনীর কাজ চলছিল

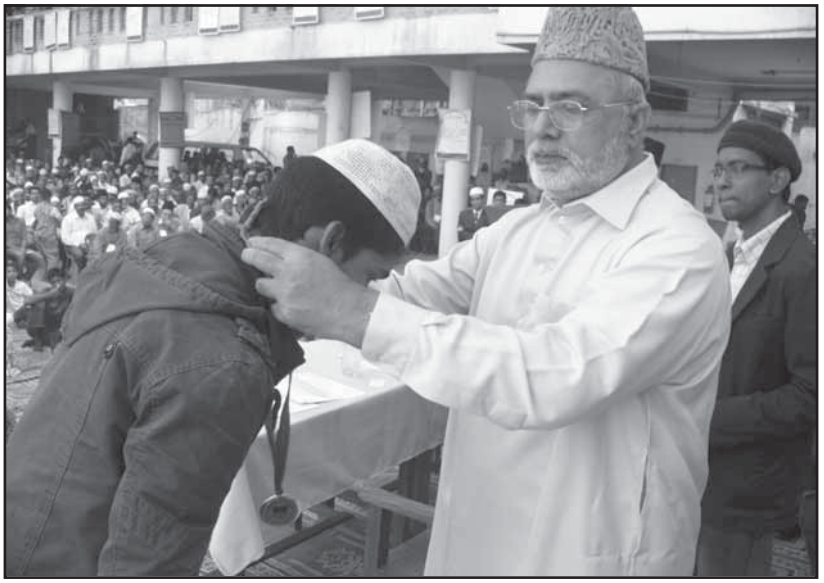

কৃতী ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি।

অবক্ষয় থেকে রক্ষা পাওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি তুলে ধরেন।

এরপর একটি নযম পরিবেশন করেন জনাব এস, এম রহমতুল্লাহ্। 'ইসলামে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মুবাশ্বের মুরব্বী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় ইসলামে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব কতটুকু এবং আর্থিক কুরবানীর ফলে যে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন হয় তা কুরআনের আলোকে উপস্থাপন করেন। এছাড়া তিনি তার বক্তৃতায় বাংলাদেশের অনেক আহমদীদের আর্থিক কুরবানীর কথাও উল্লেখ করেন।

এরপর **'খাতামান্নাবীঈন ও ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন'** প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতার একাংশে বলেন, হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) এসেছেন আর যখনই তিনি দাবী করলেন তখনই পৃথিবীবাসী বলা শুরু করে দিল মানি না মানব না। হযরত নবী করীম (সা.) যত অর্থে খাতামান্নাবীঈন আমরা সব অর্থে তাকে খাতামান্নাবীঈন হিসেবে মানি। তিনি তার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করেন। আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই যে, শেষ যামানায় আগমনকারী ইমাম মাহদী তাঁর সত্যতার প্রমাণ কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তুলে ধরেন।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ টায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেবের সভাপতিত্বে। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব বশির উদ্দিন আহমদ। কাসিদা দলীয়ভাবে পাঠ করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও তার দল। বক্তৃতা পর্বে **'বাংলাদেশের আহমদীয়াত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'** সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে সুন্দর আবহাওয়ার কারণে এই জলসার সমাপ্তি হতে যাচ্ছে। ন্যাশনাল আমীর সাহেব বাংলাদেশের প্রথম আহমদী এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ (রা.) ও মৌলভী রইছ উদ্দিন (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করে বলেন, এই দুই জন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সংবাদ পেয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেটে কাদিয়ান গিয়ে বুঝে শুনে বয়আত করেছেন এবং দেশে এসে ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন।

তিনি আরেকজন আহমদীর স্মৃতিচারণ করেন, তিনি হলেন মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন সুদূর সিরিয়া থেকে আগত জনাব মুনির ইদুলবি বাংলায় অনুবাদ করছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

বক্তব্য রাখছেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে চিঠি লিখেছিলেন আপনি যে, মসীহ্ এর প্রমাণ দিন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব-এর চিঠির উত্তরও পাঠিয়েছিলেন এবং সেই চিঠি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে বাঙ্গালীদের মন জয় করেন।

মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে কাদিয়ানে যান এবং মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে বলেন, মির্যা সাহেব যা কিছুই ছিলেন কিন্তু এখন তো তিনি নেই। আপনি চলে যান। এর উত্তরে মওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব বলেছিলেন, যদি আগুন জলে থাকে তাহলে সেখানে ছাই দেখতে পাব একথা বলে তিনি কাদিয়ানে যান এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। ন্যাশনাল আমীর সাহেব সেই সব মোয়াল্লেম ও মুরব্বীদের কুরবানীর কথা উল্লেখ করেন যারা অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আহমদীয়াতের প্রচার করেছেন। তিনি বাংলাদেশ জামা'তের বর্তমান চিত্রও তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত জনাব ব্রাদার আব্দুল আলীম শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
বাংলায় অনুবাদ করছেন আলহাজ্ব আহমদ তফশির চৌধুরী

এরপর হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন। সমাপ্তি ভাষণে তিনি বলেন, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় তাই তাঁদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা সবচেয়ে বেশী কথা বলেন। কিন্তু আজ দুর্ভাগ্যবশত মনে করা হয় যে, আল্লাহ্ এখন আর কথা বলেন না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়দের সাথে এখনও কথা বলেন।

আমাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রিয় হতে হবে আর আল্লাহ্‌র প্রিয় হতে হলে তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলা জরুরী। তিনি তার বক্তৃতার পর দোয়া করান। এই দোয়ার মাধ্যমেই ৮৭তম সালানা জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

[ডেস্ক রিপোর্ট]
আলোকচিত্র : ইকরামুল হক ও মাসুদ আহমদ

নবীনদের পাতা

হযরত রাসূল করীম (সা.) ছিলেন মানবতার আদর্শ

আরবীসহ পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত্র সম্পর্কিত অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। যতদিন এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে ততদিনই তাঁর মহান জীবন সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকবে। কারণ তাঁর জীবন বিশ্ববাসীর জন্য এক পরম সম্পদ। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে জানা ও জ্ঞানার্জনের কৌতুহল মানব মনে চিরদিনই বিরাজ করবে। রাসূল (সা.) ছিলেন গোটা মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ। তাঁর এই জীবন আদর্শকে আঁকড়ে ধরার মধ্যে বিশ্ববাসীর কল্যাণ নিহিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা হযরত নবী করীম (সা.) সম্বন্ধে বলেছেন : নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে, তার জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। [সূরা আহযাব : ২১)

মানব সমাজ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যা যতই উৎকর্ষ সাধিত করছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী রাসূলদের শিক্ষা ও উপদেশ মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে শুধু মেশীন ও সরঞ্জামই সরবরাহ করেছে। কিন্তু মানুষের দ্বারা এগুলো অপব্যবহার যে হবে না এমন কোন গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ও রাসূলদের আনীত স্বর্গীয় শিক্ষা-দীক্ষা, আইন কানুন এবং তাদের ব্যবহার মানুষকে একটি উত্তম জীবন পরিচালিত করার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত রাসূল করীম (সা.) এর জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, তিনি (সা.) কোন সমাবেশে উপস্থিত হলে সম্মানজনক আসনে বসার চেষ্টা করতেন না। কোথাও গেলে প্রথমে খালি জায়গায় উপবেশন করতেন। তিনি কাউকে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতেন না। অন্যদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করতেন। তিনি লোকদেরকে খুবই সম্মান করতেন।

তিনি যখন কোন যানবাহনের উপর আরোহণ করে পথ চলতেন তখন কাউকে পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে গমন করতে অনুমতি দিতেন না। বরং সম্ভব হলে তাকে তাঁর পাশে তুলে নিতেন, আর তা না হলে তাকে নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাতের জন্য বলতেন এবং একাই চলে যেতেন।

দলবদ্ধভাবে কোথাও সফর করলে তিনি অন্যদের মতোই কাজ করতেন এবং তাঁকে বাদ রেখে অন্যকে কাজ করতে দিতেন না। কারো সঙ্গে কোন কথা দিলে বা অঙ্গীকার করলে তিনি অবশ্যই রক্ষা করতেন। তিনি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে নিয়মিত দেখা সাক্ষাত করতেন। কিন্তু অন্যায়ভাবে কারো পক্ষে সমর্থন করতেন না। নবী করীম (সা.) কাউকে পরনিন্দা করার অনুমতি দেননি। মহানবীর (সা.) উন্নত চরিত্র মাধুর্য্য প্রথমত আরব দেশে এবং পরবর্তী কালে বিশ্বে ইসলামী বিপ্লবের তরঙ্গ নিয়ে আসে।

নবী করীম (সা.) নবুওয়াত ও নেতৃত্বের মহান মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন কিন্তু মানবের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এবং তার জীবন পদ্ধতি ততোই সহজ-সরল ও নম্র ছিল যে, যখন তিনি মানুষের মধ্যে উপস্থিত হতেন তখন একজন অপরিচিত লোক তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইতো, আপনাদের মধ্যে নবী কে?

এই নশ্বর জগতের চাকচিক্য এবং বিলাসিতার প্রতি নবী করীম (সা.)-এর বিন্দুমাত্র মোহ ও আকর্ষণ ছিল না। তিনি কোন বৈষয়িক বিষয় দ্বারা আবির্ভূত ও বিমোহিত হতেন না। বরং এই বৈষয়িক জীবনকে একজন মুসাফিরের মতোই মনে করতেন।

নবী করীম (সা.) সংক্ষেপে কথা বলতেন এবং যা কিছু বলতেন তা ছিল অর্থবহ। তিনি কখনো কোন ব্যক্তির কথা বা বক্তব্য প্রকাশের সময় হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি কখনও খিটখিটে মেজাজে কথা বলতেন না এবং কখনো কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করতেন না। তাঁর নম্রতা ছিল অতুলনীয়। তিনি পরম সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল ছিলেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক যিনি মহানবী (সা.) এর ভৃত্য ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন : হযরত রাসূল (সা.) এর আহারের জন্য আমি দুধ প্রস্তুত রাখতাম। একদিন রাতে তিনি দেরী করে ঘরে ফিরলেন। আমি ভাবলাম তিনি হয় তো কোন সাহাবীর ঘরে মেহমান হয়েছেন এবং সেখানেই রাতের আহার গ্রহণ করেছেন' এই মনে করে আমি তাঁর জন্য প্রস্তুতকৃত দুধটুকু পান করে ফেলি। ইতিমধ্যে তিনি ঘরে ঢুকলেন। আমি তাঁর সঙ্গে থাকা সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, মহানবী (সা.) আহার করেছেন কিনা। তারা বললেন, তিনি কোন আহার করেন নি। নবী করীম (সা.) যখনই এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন তিনি এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করলেন না। তিনি এমন ব্যবহার করলেন মনে হয়েছিল যে, তিনি আদৌ ক্ষুধার্ত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল হৃদয়ে না খেয়ে রাত্রি যাপন করেন এবং পরের দিনও তিনি উপোস কাটান।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাযকে খুব ভালবাসতেন, কিন্তু যখন কোন বিষয়ে লোকেরা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন সে উপলক্ষে তিনি নামাযকে সংক্ষিপ্ত করতেন এবং মানুষের দাবী দাওয়া ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার ত্রুটি করতেন না। তিনি সকলের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করতেন। তিনি ধনসম্পদ এবং উচ্চ মর্যাদার জন্য সম্মান করতেন না। তিনি দাস-দাসির প্রতি অতিশয় সদয় ও দয়ালু ছিলেন। তিনি তাদের এবং দরিদ্র লোকদের দু:খ কষ্ট মেটানোর জন্য আপ্রান চেষ্টা চালাতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনো মানুষের তিরস্কার, ভর্ৎসনা এবং অসম্মানের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেন নি, তিনি মানুষের ভুলত্রুটি এবং দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করে দিতেন। অজ্ঞ ও জাহেল লোকদের অশোভন আচরণকে তিনি ক্ষমার চোখে দেখতেন।

মক্কার কোরাইশদের শত নিগ্রহ ও অত্যাচার সত্ত্বেও মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সবাইকে ক্ষমা ও মুক্ত করে দেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর "মানব প্রেম" সংক্ষিপ্ত ভাবে তাঁর সমূদয় নৈতিক গুণ এবং স্বভাব প্রকৃতিকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমার সামান্য ও তুচ্ছ জ্ঞান দিয়ে তাঁর উজ্জ্বল আদর্শের কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম। আমরা যারা নিজেদেরকে ইসলামের সত্যিকার অনুসারী বলে মনে করি, আমরা যদি নবী করীম (সা.)-এর জীবন আদর্শকে নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি তাহলেই আমাদের জীবন হবে সার্থক। মহান খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইসরাত জাহান ইতি, চট্টগ্রাম

কুরআন পাঠের গুরুত্ব ও কল্যাণ

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বহু নবী ও রাসূল আগমন করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ রহমতের ফযলে কোন কোন নবী ও রাসূলগণের উপর কিতাব নাযেল করেছেন এদের মধ্যে তওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, কুরআন ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধু খাতামুল আম্বিয়া নবী মণি সকল নবীর সেরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর আল্লাহ্‌র নেয়ামতস্বরূপ যে কিতাব নাযেল করা হয় তার নাম "কুরআন মজীদ"। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতগুলো কিতাব নাযেল হয়েছে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হল কুরআন মজিদ। মহান আল্লাহ্ তাআলা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য এই মহা কিতাব নাযেল করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি এই কিতাবের প্রত্যেকটি আদেশ, নিষেধকে মান্য করে চলে তাহলে সেই ব্যক্তি মু'মিন ও আল্লাহ্‌ওয়ালা হয়ে যাবে (ইনশাআল্লাহ্)। কুরআন এমন গ্রন্থ যাতে পূর্বের নাযেলকৃত ধর্মগ্রন্থসমূহের যা ভাল, অক্ষয়, চিরস্থায়ী ছিল এবং যে সব শিক্ষা চিরকল্যাণকর তার নির্যাস ও সারাংশ কুরআন করীমে এসে গিয়েছে। এবং সকল শিক্ষা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও উন্নতির জন্য অতি প্রয়োজনীয় অথচ পূর্বেকার ঐশীগ্রন্থে যা ছিল না সেগুলিও কুরআন করীমে সংযোজিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন নাযিল সম্পর্কে বলেছেন, এটা এরূপ কিতাব যার আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করা হয়েছে, অত:পর তাদেরকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে পরম প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ আল্লাহ্-এর তরফ হতে। (সূরা হুদ-২)

এই গ্রন্থের মধ্যে মানুষ যেন কোন প্রকার সন্দেহ প্রমাণ না করতে পারে তার জন্য আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের প্রথমেই বলেছেন "লা রাইবা ফি" এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমরা এই কিতাব নাযেল করেছি এবং আমরাই এর রক্ষণাবেক্ষণ করব"।

মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন 'হুদালিল্ল মুত্তাকীন' এ হলো মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত (অর্থাৎ পথ নির্দেশ)। আল্লাহ্ কুরআনকে মানবজাতির জন্য হেদায়াতরূপে নাযিল করেছেন। কুরআন মানবজাতির জন্য জ্যোতির্ময় দলিল-প্রমাণ এবং দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনকারী জাতির জন্য হেদায়াত ও রহমত (সূরা জাসিয়া : ২১)। এই আয়াত দ্বারা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, এই কুরআনে সকল কর্মের সমাধান আছে এবং আমাদের জন্য আছে আল্লাহ্‌র রহমত। কুরআন পাঠের কল্যাণ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উপস্থাপন করলাম।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, যে কুরআন পড়েছে এবং একে মুখস্ত রেখেছে, অত:পর তার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জেনেছে, তাকে আল্লাহ্ বেহেশ্‌ত দাখিল করবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ অবধারিত ছিল" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর এবং তা পড়তে থাক। কুরআনের উপমা এরূপ যে, যে তা শিক্ষা করে, তা পড়ে এবং তা নিয়ে রাত্রে নামাযে দাঁড়ায় তার উপমা মেশকের পূর্ণ থলির ন্যায় যা চারিদকে সুগন্ধি ছড়ায়। আর যে তা শিক্ষা করে এবং পেটে তা নিয়ে রাত্রে ঘুমায়, তার উপমা ঐ মেশকের পূর্ণ থলির ন্যায় যার মুখ বন্ধ করা হয়েছে ঢাকনী দ্বারা" (তিরমিযী, নেসাঈ)।

হযরত আবু উম্মাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "কুরআন পাঠ কর কেননা বিচার দিবসে তার (পাঠকের) শাফায়াতকারী হবে" (মুসলিম)।

হযরত আয়শা (রা.) হযরত নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, "কুরআন পাঠকারী হাফেজের দৃষ্টান্ত হলো সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ফিরিশ্‌তাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হিফজ করা তার জন্য কষ্টকর হলেও তা হিফয করে, সে দ্বিগুন পুরস্কার লাভ করবে" (বুখারী, কিতবুত তাফসীর)।

কুরআন পাঠ করার ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের ঈমানের সত্যা-সত্যের মানদন্ড একমাত্র কুরআন শরীফই হবে। কুরআন শরীফ ব্যতীত আকাশের নিম্নে অন্য কোন গ্রন্থ নেই যা কুরআন শরীফের সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে পারে, আল্লাহ্ তোমাদের বহু অনুগ্রহ করেছেন যে কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন" (কিশতিয়ে নূহ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন, "সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং তার সাথে অতি গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর, এরূপ ভালবাসা যা অন্য কারও সাথে তোমরা করনি। কেননা যেমন খোদা তাআলা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'আল খায়রো কুল্লুহু ফিল কুরআন' অর্থাৎ সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআনেই নিহিত আছে'। একথাই সত্য। আফসোস সেই লোকদের জন্য যারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে প্রাধান্য দেয়। কুরআন শরীফ তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস" (কিশতিয়ে নূহ)।

আমাদের সকলের উচিত, এই মহাগ্রন্থের যে শিক্ষা আছে তা সঠিকভাবে পালন করা এবং প্রতিদিন কুরআন পাঠ করা। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে কুরআন পাঠ করার তৌফিক দান করুন। শেষ করার আগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরও একটি কথা উপস্থাপন করছি, তিনি (আ.) বলেছেন, আমি সত্য সত্যই বলছি, যে কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত ও পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করেছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই তার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ" (কিশতিয়ে নূহ।)

এস, এম, রাশিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম

অমর সাহাবীর অমর জীবনী

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রা.)

পঞ্চম পর্ব

"আব্দুল করীমের কীর্তিগাথা কিরূপে নিরুপণ সম্ভব যিনি কিনা সাহসীকতা ও বীরত্বের সাথে সীরাতে মুস্তাকিমের পথে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক যার নাম স্বয়ং খোদা তাআলা লিডার রেখেছেন। তিনি ছিলেন খোদায়ী রহস্যের প্রাণপুরুষ এবং সুদৃঢ় ধর্মের ধনভান্ডার। হে খোদা! আব্দুল করীমের সমাধির উপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ কর এবং অশেষ আশীষ ও কল্যাণের সাথে তাঁকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করাও।"

এই কয়েকটি পংক্তিমালা সেই ফারসী নযম থেকে উদ্ধৃত যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রা.)-এর মৃত্যুতে আবৃত্তি করেছিলেন এবং পরবর্তীতে হুযূর (আ.) নিজ কিতাবে তা সংকলিত করেছেন। এই কয়েকটি পংক্তি হুযূর আকদাস (আ.) মহান ধর্মের সেবক, তাঁর আত্মোৎসর্গকৃত বন্ধু মৌলবী সাহেবের সম্মানে লিখে তাঁর বর্নাঢ্য জীবনের সুনিপুণ কীর্তির অমূল্য স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

পরিচিতি

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) ১৮৫৮ সালে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের সিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম চৌধুরী মোহাম্মদ সুলতান এবং সম্মানিতা মাতার নাম হযরত হাসমত বিবি সাহেবা (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর খেলার সাথী)। তিনি সিয়ালকোটেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। শৈশব থেকেই প্রখর মেধাবী হওয়ার কারণে পড়াশুনায় তিনি খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি সিয়ালকোটের বোর্ডিং স্কুলের শিক্ষকরূপে তাঁর কর্মময় জীবনের সূচনা করেন। খৃষ্টানদের সাথে তাদের দাবী, আপত্তি এবং তাদেরকে যুক্তি ও তর্কের সাথে পরাভূত করার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি উর্দু ও ফারসীতে 'সাফী' পদ্ধতির আলোকে কিছু পংক্তি রচনা করেন এবং সেগুলো বিভিন্ন সময় জামা'তের বন্ধুদেরকে আবৃত্তি করেও শুনাতেন।

বয়আত এবং কাদিয়ান হিজরত

হযরত মৌলবী সাহেব ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ লুধিয়ানায় অবস্থিত সুফি আহমদ জান সাহেবের গৃহে অনুষ্ঠিত 'বয়আতে উলা'-এর অনুষ্ঠানে বয়আতকারী সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রথম বয়আতের রক্ষিত রেজিষ্টার অনুযায়ী তাঁর বয়আত নম্বর ৪৩ (তেতাল্লিশ)। বয়আত গ্রহণের পূর্বে তিনি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের রচনাবলীর ভক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৯৮ সালে মাতৃভূমি সিয়ালকোট ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে কাদিয়ান চলে আসেন। কাদিয়ানে হিজরত করার পর তিনি হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহায্য সহযোগিতায় ও তাঁর পূর্ণ সমর্থনে একাধারে বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখনী ছাড়াও অসংখ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞামূলক বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁকে তাঁর পরিবারের একজন সদস্য মনে করতেন। পারিবারিক অনেক বিষয়ে হুযূর (আ.) মৌলবী সাহেবের মতামত গ্রহণ করতেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করতেন।

খিদমতে দ্বীন

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রা.) ধর্মের সেবায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁকে তাঁর একনিষ্ঠ বন্ধু বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর কথা বলার ধরণ এতো মনোমুগ্ধকর এবং আকর্ষণীয় ছিল যে–মানুষ আশ্চর্যে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেত। কথিত আছে, যখন তিনি ফজরের নামাযের পর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতেন তখন তাঁর তেলাওয়াতের মাঝে আন্তরিকতা ও অগাধ ভালবাসার এতো সংমিশ্রণ থাকতো যে, স্বয়ং হিন্দুরাও তাঁর চিত্তাকর্ষক ললিত কণ্ঠের কুরআন তেলাওয়াত শুনার জন্য দাঁড়িয়ে যেত। কুরআন করীমের অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের বর্ণনায় তাঁর নৈপুণ্যতা ছিল অসাধারণ। ইসলামের প্রতি তাঁর হৃদয়ে ভালবাসা ও প্রেমের এক সুবিশাল সমুদ্র বিরাজমান ছিল। প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতা করা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর অতিশয় মধুর অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিল। উর্দু, ফারসী ও আরবী এই তিন ভাষাতে তাঁর শুধু ব্যুৎপত্তিই ছিল না বরং তিনি এ তিন ভাষাতেই মাতৃভাষার ন্যায় অনর্গল বক্তৃতা করার ক্ষমতা রাখতেন। ইংরেজী ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি আমৃত্যু জামাতের 'ইমামুস সালাত' হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন।

হযরত মৌলবী সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক রচিত সুবিখ্যাত পুস্তক 'ইসলামী নীতিদর্শন, ১৮৯৬ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর লাহোরের টাউন হলে অনুষ্ঠিত আন্তধর্মীয় সম্মেলনে সমবেত সুধীর সামনে পাঠ করে শুনান সেখানে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাগণ একদিকে যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন অন্যদিকে অত্যন্ত মনোরম ও চিত্তাকর্ষতার সাথে তা পাঠ করার জন্য মৌলবী সাহেবেরও অভাবনীয় প্রশংসা করেন। তিনি ১৯০০ সালের ১১ এপ্রিল ঈদ-উল-আযহার নামাযের পর হযরত মসীহ্ মাওউদ কর্তৃক প্রদত্ত ঐতিহাসিক

'খুতবায়ে ইলহামীয়া'-এর লেখকদ্বয়ের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। হুযূর (আ.) যখন তাঁর ঐশী খুতবা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন তখন মৌলবী নূর উদ্দীন (রা.)-এর পাশাপাশি মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবও সাথে সাথে তা নকল করছিলেন। তা ছাড়া তিনি বিভিন্ন জনসভায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) রচিত আসমানী ফয়সালা, লেকচার লাহোর, লেকচার সিয়ালকোট প্রভৃতি পুস্তকাদী পাঠ করে শুনানোর সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জবরদস্ত পুস্তক 'মীনানুর রহমান' যার মধ্যে হুযূর আরবী ভাষার অতুলনীয় সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পাশাপাশি আরবী যে সকল ভাষার জননী তাও প্রমাণ করে দেখান। এই অতুলনীয় বইটির গবেষণা ও রচনার কাজে হুযূর (আ.)-এর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। হুযূর (আ.) তাঁর পুস্তকে তাদের কথা এভাবে স্মরণ করেছেন, "সর্বাধিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা, সাহায্য-সহযোগিতা ভাই মৌলভী নূর উদ্দীন ও ভাই মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব করেছেন। তারা সকল প্রকার সম্পর্ককে কয়েক মাসের জন্য জলাঞ্জলী দিয়ে এই পুস্তকের কাজে সার্বিকভাবে আত্মনিয়োজিত হয়েছিলেন।" [মিনানুর রহমান, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খন্ড, পৃ: ১৪৪]

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর পুস্তক 'ইযালায়ে আওহাম'-এর তৃতীয় নম্বরে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'হাব্বি ফিল্লাহে' তথা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় বিলীন আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি সাহেব এই অধমের এক অকৃত্রিম বন্ধু আর তিনি আমার সাথে সত্যিকার অর্থেই এক জীবন্ত ভালবাসার সম্পর্ক রাখেন। এর পাশাপাশি তিনি তাঁর মূল্যবান সময়ের অধিকাংশ সময় ধর্মের সেবার খাতিরেই ব্যয় করে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তৃতার মাঝে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করার মত প্রাণ রয়েছে। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার আলোকজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি তাঁর চেহারায় দৃশ্যমান। সে আমার প্রণীত শিক্ষা ও আদর্শের সর্বাধিক ঐক্যমতধারী।" [ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃ: ৫২৩]

যুগ খলীফার স্বীকৃতি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহুল মাওউদ (রা.) বলেন, "মৌলবী সাহেবের সিলসিলার সাথে এরূপ গভীর সম্পর্ক ছিল যা জামাত কোন দিন ভুলতে পারবে না। মসজিদে মুবারকের পুরনো অংশের ইট পর্যন্ত এখনো তাঁর কম্পমান বক্তৃতাবলী দ্বারা প্রকম্পিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর প্রকৃতি ও প্রেমের ন্যায় মৌলবী সাহেবের প্রকৃতি ও প্রেম ছিল।"

[খুতবাতুন নেকাহ্, ১২ জুন ১৯৪৫]

হুযূর আকদাস (আ.)-এর প্রতি মৌলবী সাহেবের অভাবনীয় ভালবাসা

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এতো সুগভীর ভালবাসা রাখতেন যে একবার তিনি তাঁর খুতবায় এ সম্পর্কে বলেন, "আমার আত্মা ইমামের জন্য উদ্বেলীত হয়ে পবিত্র স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহমান আর আমি নিশ্চিত অবগত আছি বর্তমানে আমি স্বয়ং হযরত আকদাসের পবিত্র কণ্ঠস্বরূপ।"

[৩১৩ জন নিষ্ঠাবান বন্ধু, পৃ: ৪১]

মৌলবী সাহেবের লিখনী

হযরত মৌলবী সাহেব তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে অসংখ্য পুস্তকাদি লিখেন। তার মধ্যে আল হাক্ব, আল কাউলুল ফসীহ, লেকচার গুনাহ, লেকচার মউত, হাদীয়ে কামেল, সীরাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.), জামীমায়ে ওয়াকেআতে সহীয়াহ, খুতবাতে কারিমা, খিলাফতে রাশেদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি হযরত আকদাসের কোন কোন কিতাব ফারসী ভাষায় অনুবাদ করার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যমন্ডিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পুস্তকের আরবী অংশের ফারসীতে 'আত তবলীগ' নামে উর্দু পুস্তক 'আইয়ামুস সুলাহ্' ফারসীতে সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন।

ওফাত লাভ

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) ডায়বেটিক্‌স তথা বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৌলবী সাহেবের অসুস্থাবস্থায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিকট ইলহাম হয়, 'দো শাহতির টুট গায়ে' তথা দু'টি স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়লো। ইলহাম হওয়ার কিছুদিন পরেই ১১ অক্টোবর ১৯০৫ সালে তিনি কাদিয়ান দারুল আমানে ইন্তেকাল করে তাঁর আপন প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁকে কাদিয়ানের বেহেশতি মাকবেরায় সমাহিত করা হয়। তিনি বেহেশতি মাকবেরায় সর্বপ্রথম সমাহিত ব্যক্তি।

'হামিয়ে দিঁ আনেকাহ ইযদাঁ নাম ও লিডার নেহাদ'

তিনি হলেন সত্য ধর্মের একনিষ্ঠ সহায়ক যার নাম স্বয়ং লিডার রেখেছেন। (মাসিক খালিদ অবলম্বনে)

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org;www.mta.tv

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম

জিহাদ বর্তমান বিশ্বের অতি পরিচিত একটি শব্দ। আর এই শব্দকে ঘিরে রয়েছে নানা ধরণের মতবিরোধ মতপার্থক্য ও তর্ক-বিতর্ক। জিহাদের শাব্দিক অর্থ সাধনা বা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। আর প্রকৃত জিহাদ হচ্ছে 'আত্মিক জিহাদ' (জিহাদে আকবর) বা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। আত্মিক সংশোধন ও উত্তম নৈতিকতার সাধনা বা সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত জিহাদ বা বড় জিহাদ। আর অস্ত্রের জিহাদ আত্মিক জিহাদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র মাপের জিহাদ। ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে, প্রেমময় আল্লাহর প্রতি প্রেম - প্রীতির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে তাঁর রাহে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দেয়ার মাধ্যমে - আত্মত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে। এজন্যই ইসলামে জিহাদের বিধান পেশ করা হয়েছে। প্রিয় নবী (সা.) যখন মক্কা থেকে অত্যাচারিত - উৎপীড়িত হয়ে মদিনায় হিজরত করলেন, তখন তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায় বহু অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, নির্যাতিত মুসলমান ও অমুসলমান উভয়েই শান্তি লাভের আশায় মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং জিহাদে আকবরে সামিল হন। আজ হতে প্রায় পনেরশত বছর পূর্বে মহান আল্লাহ তাআলার প্রত্যাদেশ বলে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষায় মুসলমানদের অস্ত্রের জিহাদের অনুমতি ছিল। তার মানে এই নয় যে ইসলাম ধর্মে সর্ব অবস্থায় অস্ত্রের জিহাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তথা ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষার্থে সর্ব প্রথম অস্ত্রের জিহাদকে বৈধ করা হয়েছিল। তবে তা করা হয়েছিল ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষার্থে। মুসলমানদেরকে যুদ্ধবাজ করার জন্য নয়। যদি যুদ্ধ ব্যতিত শান্তি রক্ষা সম্ভব হত তাহলে ইসলাম বদরের যুদ্ধকে অনুমোদন দিত না। এর স্বপক্ষের উৎকৃষ্টতম প্রমাণ হচ্ছে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের হুদাইবিয়ার সন্ধি।

মুসলমানদের উদ্দেশ্য যদি যুদ্ধ করাই হত তাহলে কখনই হযরত মুহাম্মদ (সা.) বদরের যুদ্ধের পর কুরাইশদের সঙ্গে শান্তি সন্ধি (হুদাইবিয়ার সন্ধি) করতেন না। বরং যুদ্ধই করতেন। ইসলামের অন্যতম নীতি হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধবিহীণ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ না করা। পবিত্র কুরআন শরীফে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে "ফাতহুমমুবিন" বা মহাবিজয় বলা হয়েছে এবং হযরত আবুবকর (রা.) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে আমরা (মুসলিমরা) যেরূপ জয়ী হয়েছিলাম অন্য কোন সময় আমরা সেরূপ জয়ী হইনি। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করার দরুন মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ ভাবে মক্কা বিজয় করে নেন।

জিহাদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে আছে-

"এবং আল্লাহর পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।" (২:১৯১)

"এবং তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দীন আল?াহরই জন্য (কায়েম) হয়। অত:পর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তবে (জেনো যে) কারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই, কেবল যালেমদের ব্যতিরেকে।" (২:১৯৪)

"এবং তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং ঐ সকল অসহায় দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ কর না, যারা বলে, হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদেরকে এই শহর হতে বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীগণ বড়ই যালেম এবং তুমি নিজের সন্নিধান হতে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।" (৪:৭৬)

জিহাদ সম্পর্কে পবিত্র হাদীস শরীফে আছে - হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে-একমাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ ও তার বিধানের সত্যতার প্রতি স্বীয়বিশ্বাস প্রতিপন্ন করে দেখানো ব্যতীত আর কিছুই তাকে বাড়ী হতে বের করতে পারে না, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর ব্যাপারে জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন যে, তাঁকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন অথবা সে (জিহাদে অংশগ্রহণ করার কারণে) যা কিছু পুরস্কার এবং গনিমত লাভ করেছে তৎসহ, যেখান থেকে সে (জিহাদে) বহির্গত হয়েছে সেখানে (সহি সালামতে) ফিরিয়ে আনবেন।" (বুখারী,কিতাবুল জিহাদ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) খন্দকের যুদ্ধে মদীনা আক্রমণের জন্য আগত সম্মিলিত কাফের বাহিনীর জন্য দোয়া করেছেন। তিনি তাঁর দোয়ায় বলেছেন, হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী ও অচিরেই হিসেব গ্রহণকারী, তুমি সবগুলো দলকে (কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত কর)। হে আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত ও মূলোৎপাটিত কর"। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

আমরা অনেক বাহ্যিক শত্রুকে ধ্বংস করি, কিন্তু বাহ্যিক শত্রু অপেক্ষা নিকৃষ্টতম শত্রু আমাদের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকে সে শত্রু হল 'নফস' বা প্রবৃত্তি। আর এই অভ্যন্তরীণ শত্রুকে ধ্বংস করা শুধু মানবীয় জ্ঞান কৌশল দ্বারা সম্ভবপর নয়। মানুষের নফস তার সকল শত্রু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর। আর নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করাই হল প্রকৃত জিহাদ। কারণ সকল প্রকার শত্রুই মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষতি করে, কিন্তু নফস তার চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণ বিনষ্ট করে এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষতি, চিরস্থায়ী জীবনের ক্ষতির তুলনায় অতি নগণ্য ক্ষতি।

নফস মানুষের অভ্যন্তরে রয়েছে, তাকে আয়ত্তে এনে সংযত করতে না পারলে তা মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, যা হয় চিরস্থায়ী জীবনের ধ্বংস। জিহাদ যদি করতেই হয়, তাহলে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করাই উত্তম জিহাদ বলে গণ্য করা ঠিক হবে। এ বিষয়ে সূফী মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী (র.) বলেন, তাসাওউফের মূল উদ্দেশ্য নফসকে পরাজিত করে বশে রাখার সংগ্রাম করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে

যাকে জিহাদে আকবর (বড় জিহাদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে। একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকার মাধ্যমেই সে জিহাদ পরিচালিত হতে পারে, যার উৎসমূল হচ্ছে কুরআন ও হাদীস।

এবং প্রকৃত খিলাফত বিহীন জিহাদ কি আদৌ সম্ভবপর।

বিগত পনেরশত বছরের মুসলিম ইতিহাস এসম্পর্কে কি নমুনা প্রদান করেছে তা পর্যালোচনা করা কি আবশ্যক নয়? সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) - এর দল ত্যাগকারীদেরকে কি আমরা জিহাদি বলতে পারি? কখনোই না। বরং তাদেরকে খারিজী বা স্বদল ত্যাগকারী বলা হয়ে থাকে। প্রকৃত জিহাদ হতে হলে অবশ্যই খিলাফতের অধিনস্তে বা স্বীকৃতিতে হতে হবে।

আর যাদের মধ্যে প্রকৃত খিলাফত প্রতিষ্ঠিত নেই, তারা শুধু আত্মিক জিহাদ বা জিহাদে আকবরে সামিল হতে পারবে। এছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন পথ শরীয়ত সম্মত হবে না। প্রকৃতপক্ষে বিগত দেড় হাজার বছরের মুসলিম ইতিহাসে আমরা জিহাদের যে নমুনা দেখতে পাই, তা হল প্রিয় নবী (সা.)-এর ওফাতের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে খিলাফত চলাকালিন সময়ের জিহাদ।

মসজিদে নামাযরত অবস্থায় মানুষ হত্যা করা কোন ধরণের জিহাদ? কোন রাষ্ট্রের ৬৩টি জেলায় বিনা কারণে একই সময়ে বোমা ব্রাস্ট করে সাধারণ মানুষের জান-মালের ক্ষতি করা কোন ধরণের জিহাদ? বিয়ের বাড়িতে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা কোন ধরণের জিহাদ? গাড়ী বোমা বিস্ফোরণ করে মানুষ হত্যা করা কোন ধরণের জিহাদ? ইসলাম কি এই ধরণের জিহাদের স্বীকৃতি দেয়? কথিত জিহাদীরা কি বলতে পারবেন পবিত্র কুরআনের এমন একটি আয়াত তাদের এই সমস্ত ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর সমর্থন করে অথবা এমন কোন একটি হাদীস যা তাদের কাজের সমর্থনে সমর্থ।

তাদের এ ধরণের ধ্বংসাত্মক কাজের ফলে কি বিশ্বব্যাপী মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কী? না কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থার কল্যাণকর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? বিশ্ব দরবারে মুসলমানদের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে কী? উত্তর একটিই "না"। বরং তাদের এ ধরণের ধ্বংসাত্মক কাজের দরূন সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তারা কি প্রমাণ করতে পারবে ইসলামের শরীয়তের কোথাও এই ধরণের জিহাদের কথা বলা আছে। তবুও তারা যদি এই সকল জঘন্যতম কাজ কে জিহাদ বলে আখ্যা দেয়, তাহলে তাদের কাছে চেলেঞ্জ থাকল পারলে এ ধরণের কাজের সমর্থনে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত পেশ করুন যা এ ধরণের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী, যা মানবতা বিরোধী ও ইসলামী শরীয়ত বিরোধী ,তা ইসলাম জিহাদ বলে স্বীকৃতি দেয়। তারা পারলে হাদীস শরীফের এমন একটি হাদীস পেশ করুক, যা তাদের ধ্বংসাত্মক কাজকে সমর্থন করে। তারা জানে তারা তা প্রমাণ করতে পারবে না ।

কারণ ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম জগতে এসেছে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, ইসলাম সর্বাঙ্গীন মানব কল্যাণ সাধন করতে এসেছে। মানুষকে ধ্বংস করতে ইসলাম আসেনি। বরং পথভ্রষ্ঠ মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে ইসলাম এসেছে। জিহাদ শব্দকে পূজি করে কিছু সংখ্যক কথিত জিহাদী (ইসলামী আকিদার সঙ্গে সঙ্গতী বিহীন ব্যক্তিবর্গ) যারা নিজেদেরকে মুসলিম জিহাদী বলে দাবী করে থাকেন ! তারা আদৌ ইসলামী জিহাদের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয় বলে এরূপ ঘৃণ্য ও জঘণ্য কাজকে (মানবতা বিরোধী কাজকে) ইসলামী জিহাদ বলে আখ্যা দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

তারা যা করছে তা কুরআন ও হাদীস সম্মত নয়। সুতরাং যারা এই সমস্ত ধ্বংসাত্মক কার্য সম্পাদন করেন ও সমর্থন করছেন, তারা কোন অবস্থাতেই নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করতে পারেন না। কারণ ইসলাম এ শিক্ষা দেয়নি এবং ইসলামী আকিদা মতে, এ সকল ধ্বংসাত্মক কাজ কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

কেবল মাত্র ইসলামের শত্রুর দ্বারাই এই সকল ধ্বংসাত্মক কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। তাদের এধরণের কাজের লক্ষ্য ইসলামের বদনাম সাধন ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়। তারা ইসলামকে অত্যন্ত নিন্দনীয় মানবতা বিরোধী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তারা যে ধরণের ধ্বংসাত্মক কর্মকে জিহাদ বলে আখ্যা দেয়, তার ফলে না তো ইসলামের কোন উন্নতি সাধিত হচ্ছে, না বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। বরং তাদের এসমস্ত মানবতা বিরোধী ঘৃণ্য কাজের দরুন সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তারা শত-সহস্রবার চেষ্ঠা করেও ইসলাম ধর্মকে কলুষিত করতে পারবেন না। কারণ এ ধর্ম হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম ও বিশ্ব মানবতার ধর্ম।

এ ধর্ম আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম। এ ধর্ম ধ্বংস করা জগতের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ইসলাম কখনোই কোন ধ্বংসাত্মক কাজের সমর্থন করে না। আর যা ইসলাম সমর্থিত কাজ নয়, তা সম্পাদনকারী কিভাবে নিজেকে একজন মুসলিম বলে দাবি করতে পারে এবং তার কাজকে ইসলামী জিহাদ বলতে পারে। তার বা তাদের কুকার্যাবলীর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব, সম্পূর্ণ তাদের। তাদের কুকার্যাবলীর দায়-দায়িত্ব আমরা সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা নিতে পারবো না। ইসলাম বিশ্ব মানবকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব বন্ধুত্বকে কায়েম রাখতে চায়। বিশ্ব শান্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে চায় এবং ইসলাম অবশ্যই মানবতার উৎকর্ষ সাধন করতে চায়।

মুসলমানরা কোন দিন জনবল বা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেননি। বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে খিলাফতের আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজনে জিহাদ করেছেন বা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেছেন। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিশ্বাস করেন জনবল বা অস্ত্রবলের কারণে কোন দিন ইসলামের বিজয় সূচিত হবে না। বরং মহান করুনাময় আল্লাহর ইচ্ছাতেই ইসলামের বিজয় সূচিত হবে।

সিকদার মোবাশ্বের আহমেদ আদনান, রংপুর

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল 'ইসলাম প্রচারে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর সাহাবীদের কুরবানী'। পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

ইসলাম প্রচারে হযরত রাসূল করীম (সা.) - এর সাহাবীদের অবদান

মহান আল্লাহ্ তাআলা বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট মানুষকে সুপথের সন্ধান দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য মহামানবদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তারা হলেন আমাদের পথ প্রদর্শক। আমরা তাদের নবী রাসূল হিসেবে জানি।

আইয়্যামে জাহিলয়াতের যুগে বিশ্ব-মানবতার দূত হিসেবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ইসলামের প্রচারে এবং পথ হারা আত্মভোলা মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ নির্দেশ করতে তিনি ও তাঁর সাহাবীদের কুরবানী অনস্বীকার্য।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন ইসলামের দাওয়াত দেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফিয সাহাবী শহীদ হওয়ায় কুরআন বিপন্ন ও বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে আবু বকর (রা.) সমগ্র কুরআন গ্রন্থাকারে একত্রিত করেন। মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.) এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। হিজরত করার পর একবার মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, তিনি দুস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করেন।

মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায়, মহানবী (সা.) মসজিদে নববী সম্প্রসারণের ইচ্ছা পোষণ করলে, তিনি উসমান (রা.) মসজিদ সংলগ্ন জমি ক্রয় করে, এর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। তাবূক যুদ্ধে ৩০,০০০ সৈন্যের ব্যয়ভার (এক-তৃতীয়াংশ) তিনি একাই বহন করেন এবং রোমীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এক হাজার উট দান করেন। এছাড়া কুরআন সংকলনের ভূমিকার জন্য তাঁকে "জামেউল কুরআন" বলা হয়। উহুদ যুদ্ধের সময় হযরত তালহা (রা.) তার হাত মুহাম্মদ (সা.) এর মুখের সামনে আড়াল করে ধরেন, যাতে করে বিপরীত দিক থেকে আসা শত্রুপক্ষের তীর রাসূলে করীম (সা.) পবিত্র মুখমন্ডলে আঘাত না করে। এভাবে একের পর এক তীরের আঘাতে হযরত তালহা (রা.) এর হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পরে।

বদরের যুদ্ধের সময় হযরত মেকদার বিন আমক (রা.) মুহাম্মদ (সা.) কে বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা মূসা (আ.)-এর সাহাবীদের ন্যায় আপনাকে কখনোই বলবো না, তুমি আর তোমার প্রভু যাও এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, আমরা এখানেই বসে থাকবো, বরং আমরা আপনার ডানে লড়ব, আপনার বামে লড়ব, আপনার সামনে লড়ব, আপনার পিছনে লড়ব। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে দুশমন আপনার ক্ষতি সাধন করতে এসেছে তারা আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না, যতক্ষণ তারা আমাদের লাশের উপর দিয়ে না যায়।"

ইসলাম প্রচারে রাসূলে করীম (সা.)-এর সাহাবীরা যেমন স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা করুন আমরাও যেন সকল প্রকার কুরবানী করতে এবং খলীফার নির্দেশমত ইসলামের প্রচারে অংশগ্রহণে সদা প্রস্তুত থাকি। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইসমত আরা চৌধুরী, চট্টগ্রাম

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। প্রতি সংখ্যার পাঠক কলামে লিখার জন্য একটি নির্দ্ধারিত বিষয় উল্লেখ থাকবে।

এবারের পাঠক কলামের বিষয় **'হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর আগমন'**। আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ মার্চ, ২০১১ এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)

৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সংবাদ

১ম দ্বাদশোর্ধ জাতীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন ২০১০ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে গত ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ১ম জাতীয় দ্বাদশোর্ধ ওয়াকফে নও সম্মেলন ঢাকার দারুত তবলীগে অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ সম্মেলনে দেশের মোট ৪০টি জামাত থেকে ওয়াকফে নও এবং তাদের পিতা-মাতা, কর্মকর্তা ও অন্যান্য মিলে সর্বমোট প্রায় ২৫০ জন সদস্য-সদস্যা অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৯১ জন ওয়াকেফীন ও ৫৩ জন ওয়াকেফাত রয়েছেন।

উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকি, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। মোহতরম আহমদ তবশির চৌধুরী, সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও ও ইনচার্জ এমটিএ। ড. আব্দুল্লাহ্ শামস বিন তারেক, এসোসিয়েট প্রফেসর, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। লে: কমান্ডার (অব:) মোহতরম জাফর আহমদ, মোহতরম আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ, মোহতরম মওলানা বশিরুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলাহ, সদর আনসার, মোহতরম মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্, সদর খোদ্দাম, মোহতরম আবু নঈম আল মাহমুদ, সদর লাজনা এবং ওয়াতেকফাতদের জন্য সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন মোহতরমা নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

ফতুল্লায় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৪/১২/১০ইং হতে ২৬/১২/১০ইং পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফতুল্লায় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ক্লাসে শিক্ষক হিসেবে দায়ীত্ব পালন করেন মওলানা আরিফুর রহিম ও খাকসার। ২৪/১২/১০ইং বাদ ফজর হতে ক্লাস আরম্ভ হয় এবং ২৬/১২/১০ইং যোহর নামাযের আগে শেষ হয়। এছাড়া কেন্দ্র হতে ২ জন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদান করেন। উল্লিখিত ক্লাসে খোদ্দাম ১১ জন, আতফাল ৭ জন, লাজনা ২৩ জন, নাসেরাত ৭ জন, আনসার ৭ জন, এছাড়া লাজনা ও পুরুষের মধ্যে ৬ জন মেহমান সহ সর্বমোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন। ক্লাশে উপস্থিত সদস্য সদস্যাগণ অত্যন্ত আগ্রহ ভরে ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন এবং ৫ ওয়াক্ত নামাযে উপস্থিত হন। ২৬/১২/১০ইং বাদ যোহর পরীক্ষা নেওয়া হয়। বাদ মাগরিব সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠান মওলানা আরিফুর রহিম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সাইফুল ইসলাম, নযম পাঠ করেন জনাব জাহাঙ্গীর আলম। এরপর ক্লাসের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন জনাবা ফরিদা বেগম, জনাবা শারমিন সুলতানা ও জনাব লুৎফর রহমান। তারপর নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করি খাকসার। সবশেষে সভাপতি সাহেব ভাষণ দেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন। শেষে খাকসার ইজতেমায়ী দোয়া পড়িয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করি।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে ৩ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৮, ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর ২০১০ইং তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস সাফল্যের সাথে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত, হাদীস পাঠ, নযম ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসের উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরমা বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর। উক্ত ক্লাসে বিভিন্ন তালিম তরবিয়তীমূলক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। 'হাকীকাতুল ওহী' পুস্তক সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন, আরফিন আক্তার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেকে কোন স্তরের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন এ সম্পর্কে আলোচনা করেন মিসেস আফরোজা মতিন। বয়আতের ২নং শর্ত নিয়ে আলোচনা করেন, আমাতুস সামী। একজন প্রকৃত আহমদী মা কেমন হবেন এ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন মোসলেহা জাফর। ইসলামী পর্দা কিরূপ হওয়া উচিত এ বিষয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট সাহেবা। বয়আতের ৩নং শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করেন নাফিয়া শারমিন ক্লাসে কুইজ ও কুরআন তেলাওয়াত

প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। উক্ত ক্লাসে প্রথম দিন ৮১ জন, ২য় দিন ৭৪ জন এবং ৩য় দিন ৮৭ জন লাজনা নাসেরাত বোন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সমাপনী ভাষণ, পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে এই তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি হয়।

মিলা পাটোয়ারী

বানিয়াজানে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

৩-১-২০১১ তারিখ রোজ সোমবার বানিয়াজান আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খোদ্দামদের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ রুবেল আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ। মহানবী (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায় ক্রমে বিভিন্ন বক্তাগণ আলোচনা করেন। দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ রুবেল আহমদ

ঘাটুরায় নতুন বছর উপলক্ষ্যে তালিমী সভা অনুষ্ঠিত

০১/০১/২০১১ইং ফজর নামাযের পর আমাদের ঘাটুরা মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে দোয়া ও কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিশেষ তালিমী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তৃতা পর্বে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রাখেন মৌ. এস, এম, হাবিবুল্লাহ্‌, মোহাম্মদ দুলাল মিয়া, মৌ. এনামুল হক রনী, এস, এম, ইব্রাহীম বক্তব্য রাখেন।

মোহাম্মদ দুলাল মিয়া

নূরনগরে আতফালুল আহমদীয়ার তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

নূরনগর ইশ্বরদী "মসজিদুল মাহদী"-তে ১লা জানুয়ারী ২০১১ তাং হতে ৬ জানুয়ারী পর্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী খোদ্দামুল আহমদীয়ার সহযোগিতায় আতফালুল আহমদীয়ার তালিম তরবিয়তী ক্লাস নেয়া হয় এবং ০৬/০১/১১ তাং ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। ক্লাস পরিচালনা করেন সর্বজনাব আশরাফ আলী খান, গিয়াস উদ্দীন ও মোশাররফ হোসেন। ০৬/০১/১১ তারিখে রাজশাহী মজলিস হতে ২ জন খোদ্দাম এর সহযোগিতায় পরীক্ষা ও খেলাধূলা পরিচালনা করা হয় এবং পরিশেষে পুরস্কার বিতরণের পর জামাতের প্রেসিডেন্ট দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমায় নূরনগর জামাতের ৮ জন তিফল, ৩ জন আতফাল, ৪/৫ জন খোদ্দাম ও কয়েকজন আনসারসহ মোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

আশরাফ আলী খান

উথলীতে তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৬/১১/২০১০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ জনাব আবুল হায়াত ভাইস প্রেসিডেন্ট উথলীর সভাপতিত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ উথলীর যৌথ আয়োজনে বিশেষ তরবিয়তী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন নওমোবাইন হাফেয ক্বারী মৌলবী শাহজালাল মিয়া। জামা'তি তরবিয়তী বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব যয়ীম মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ উথলী। সভাপতি সাহেব কেন্দ্রীয় তরবীয়তের আলোকে আহমদীদেরকে আলোকিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে দোয়ার মাধ্যমে তরবিয়তী অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

উথলী জামা'তে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) রচিত 'জরুরতুল ইমাম' পুস্তক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৩/১২/২০১০ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ জনাব আব্দুল গফুর প্রেসিডেন্ট উথলীর সভাপতিত্বে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত পুস্তক 'জরুরতুল ইমাম'-এর উপর এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব রাজিব মাহমুদ মিয়া। উক্ত কিতাবের উপর আলোচনা করেন জনাব হাফেয ক্বারী মৌলবী শাহজালাল মিয়া, সরফরাজ আব্দুস সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী, জনাব আবুল বাশার মিয়া, সভাপতি সাহেব পুস্তকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

উথলীতে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান প্রদর্শন

গত ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর ২০১০ সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার মাধ্যমে উথলী জামা'তের বিভিন্ন হালকা ও পকেট থেকে জেরে তবলীগ বন্ধুগণ, নওমোবাইন বন্ধুগণ এবং আহমদী ভ্রাতাগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীতে এসে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। আগত জেরে তবলীগ ভ্রাতা ও নওমোবাইন বন্ধুগণ সত্যকে উদঘাটনের জন্য সরাসরি সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানে ফোন করে প্রশ্ন করেন এবং বিজ্ঞ আলোচকদের উত্তর পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে প্রতি দিন ৮/১০ জন মেহমান ও ১৮/২০ জন আহমদী অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

উথলীতে তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৯/০১/২০১১ইং রোজ রবিবার বাদ জোহর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীতে জনাব আব্দুল গফুর প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে এক বিশেষ তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মেহমানগণ সত্যকে জানার জন্য অনেকগুলো প্রশ্ন করেন। কুরআন, হাদীসের আলোকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মুয়ায্‌যেম আহমদ সানী

সিরাজগঞ্জ হালকার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৫/১২/২০১০ইং রাত্রে সিরাজগঞ্জ হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব সালাম সাহেবের সভাপতিত্বে এবং কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাল্যজীবন, নবুওয়াত জীবন, ইসলাম প্রচার এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর রাসূল প্রেম নিয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। শেষে সভাপতি সাহেব রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ২ জন জেরে তবলীগ সহ মোট ১০ জন উপস্থিত ছিল। শেষে দোয়া ও রাতের খাবারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

২য় বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহ
মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উদ্বোধনী অধিবেশন ঃ গত ২৮/১২/২০১০ইং তারিখ বাদ মাগরিব মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ২য় বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহ এর উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব শেখ সাদী জেলা কায়েদ। এরপর কুরআন তেলাওয়াত ও নযম উর্দ্দু পেশ করেন যথাক্রমে জনাব শেখ আহবাব হুসেন শামস এবং জনাব বশির আহমদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোস্তাক আহমদ খন্দকার নায়েব আমীর ও বিশেষ অতিথি ছিলেন এখতিয়ার উদ্দিন শুভ নাযেম আতফাল। জেলা কায়েদ এর উদ্বোধনী ভাষণের পর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার (নায়েম আমীর) এবং জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ নাযেম আতফাল। দোয়া পরিচালনা করেন নায়েব আমীর সাহেব।

পালিত কর্মসূচী : শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে যে সমস্ত শিক্ষণীয় প্রতিযোগিতা পর্ব ছিল তা হল : কুরআন তেলাওয়াত, নযম, কবিতা, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা, চিত্রাংকন, গণিত অলিম্পিয়ার, উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ, পয়গামে রেসানী (বাংলা এবং ইংরেজী পৃথক ভাবে), বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, দরূদ পাঠ, শিক্ষা সফর এবং বিশেষ আলোচনা সভা। খেলাধূলার মধ্যে ছিল-ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন। এবারের বিতর্কের বিষয় ছিল "দারিদ্রতায় দুর্ণীতির কারণ" ৩ জন করে ৬ জন বিতর্কীক পক্ষে বিপক্ষে লড়েন, বিপক্ষদল বিজয় লাভ করে। রচনার বিষয় ছিল **"দূর্নীতি প্রতিরোধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা"**। শিক্ষা সপ্তাহের ৫ম দিনে সকাল ৮টায় কায়েদ সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে ৩৫ জন আতফাল টিম রওয়ানা দেয়। শিক্ষা সফরে আশুগঞ্জ সার কারখানা, আবাসিক এলাকা, মেঘনা সেতু, আশুগঞ্জ কলেজ এবং স্কুল পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালীন সময় স্থানীয় ২ জন বাসিন্দা এবং ১ জন স্টাফ আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করেন। দুপুরের খাবার এবং যোহর আসর নামায আহমদী সদস্য জনাব মাহবুব আলম সাহেবের বাড়িতে আদায় করা হয়। ১০ ঘন্টা ব্যাপী উক্ত সফরে নেতৃত্ব দেন নাযেম আতফাল এবং সহকারী নাযেম আতফালদ্বয়। উক্ত দিন মাগরীব বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কায়েদ বি, বাড়িয়ার সভাপতিত্বে। কুরআন তেলাওয়াত, নযম এবং দোয়ার পর বক্তৃতা করেন ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব এবং আতফালদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দাকার (নায়েব আমীর), ভাল ছাত্র হওয়ার কৌশল এবং আতফালদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে জনাব শফিকুর রহমান ভূইয়া (শিক্ষক অন্নদা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং প্রধান ট্রেইনার কুমিল্লা বোর্ড), আতফালদের সাংগঠনিক দায়িত্ব সম্পর্কে জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, নাযেম আতফাল। সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার পর সবাইকে আপ্যায়ণ করা হয়।

পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেন মোহতরম আমীর সাহেব। আহাদ পাঠ এবং আমীর সাহেবের দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে ২য় বার্ষিক শিক্ষা সপ্তাহের কার্যক্রম শেষ হয়।

প্রোগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তীব্র শীত উপেক্ষা করে প্রত্যেক দিন বাদ মাগরীব গড়ে ৯৮ জন আতফাল, ১৬ জন খোদ্দাম, ১৪ জন পিতা সহ সর্বমোট ১২৮ জন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, শিক্ষা সপ্তাহের সংবাদ স্থানীয় ২টি পত্রিকায় প্রকাশ হয়।

সাইফুর রহমান

বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব

আমার বড় মেয়ে খওলাদীন উপমা গত ১৯-১২-১০ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৯ইং এর জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে উপস্থিত বক্তৃতা খ-গ্রুপে তৃতীয় স্থান অর্জন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, সে নারায়ণগঞ্জ উপজেলা থেকে ১ম স্থান, জেলা পর্যায়ে ২য় স্থান এবং ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে ২য় স্থান অর্জন করে জাতীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। গত ২১-১২-২০১০ইং তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে সে পুরস্কার গ্রহণ করে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহজাহান মিয়া এম, পি,র হাত থেকে সনদ পত্র গ্রহণ করে। সে আপনাদের সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী। জামা'তের সকলের নিকট তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান দর্শন ও নওমোবাইন কর্মশালা

সদ্য সমাপ্ত সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান চলাকালে কেন্দ্রের অনুমোদনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রংপুর নও মোবাইন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সময়ে ১৭ জন নওমোবাইন ভ্রাতা উপস্থিত থেকে জামা'তী জ্ঞান আহরণ করেন। একই সময়ে প্রতিদিন যথাক্রমে ১৫ জন, ২০ জন, ২৫ জন, ২৫ জন জেরে তবলীগ ভ্রাতা সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান শেষে দুই জন ভ্রাতা বয়আত গ্রহণ করে জামা'তে দাখিল হন।

মোহাম্মদ মাহবুবুল ইসলাম

একটি শোক সংবাদ
দোয়ার এলান ও শোক প্রস্তাবনা

জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের এক বিশিষ্ট প্রবীণ প্রিয় আহমদী ভ্রাতা জনাব মুহাম্মদ ইয়ামিন সাহেব গত শুক্রবার ২১ জানুয়ারী রাত ৮টায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ঢাকায় আকস্মিক অসুস্থ হয়ে স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন – মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

জামাতের এই প্রবীণ ভ্রাতা সম্পর্কে আমাদের নতুন প্রজন্মের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মুহাম্মদ ইয়ামিন সাহেবের পিতা মরহুম মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব হলেন বাঙ্গালীদের আহমদীয়াত বিস্তারের পথিকৃৎ এদেশের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত বড় মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের জামাতা।

মরহুম মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেব ছিলেন পাবনা জেলার প্রথম আহমদী এবং তিনি সেই ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলার প্রথম আমীর সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আহমদীয়াত বিস্তারে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইয়ামিন সাহেব ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান হিসেবে যথার্থই ঐতিহ্য বহন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির আজীবন-সদস্য ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্কাউটিংয়ের বেডেন পাওয়েল ফেলো ছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল ও মানবদরদী। আমাদের নতুন প্রজন্মের অনেকেই হয়তো বা জানেন না যে, মুহাম্মদ ইয়ামিন সাহেব বাংলাদেশ আহমদীয়া জামা'তে খেদমতের ক্ষেত্রে এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিশেষভাবে জামা'তের প্রকাশনার খেদমতে ও বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ অবদান রেখেছেন। শনিবার সকালে বেইলী রোডের বাসায় তাঁর প্রথম জানাযা পড়া হয়, এরপর বকশীবাজারস্থ আমাদের দারুত তবলীগে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁর মরদেহ দেশের বাড়ি পাবনা জেলার ফরিদপুর থানার বনওয়ারী নগরের খলিশাদহ গ্রামে নেওয়া হয় ও সেখানে জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। আমরা চট্টগ্রাম জামা'তের পক্ষ থেকে মরহুমের পরিবারকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ থেকে উচ্চতর মোকাম দান করুন। তাঁর গুণাবলী তাঁর ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যেও সম্প্রসারিত হোক এ কামনা করি এবং আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁর পরিবারকে সাব্‌রে জামিল দান করেন এই দোয়া করি।

সৈয়দ মমতাজ আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী
পক্ষে-আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম

শোক সংবাদ

গত ১৪ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় আকস্মিক ভাবে আমাদের মধ্য থেকে চির বিদায় নিলেন আমাদের সবার প্রিয় বরিশাল জামা'তের প্রেসিডেন্ট ডা: ফরিদ আহমদ সাহেব। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। মরহুম ডা: ফরিদ আহমদ সাহেব ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ আহমদী। তিনি ছিলেন একজন মুসী। চাকুরী জীবনে ছিলেন একজন অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান সরকারী কর্মকর্তা। জামা'তের সকল কাজে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সবার আগে এগিয়ে আসতেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ কন্যা, ১ পুত্র এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমারা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ তাআলা মরহুমকে জান্নাতের উচ্চ মোকাম দান করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যকে তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বেশি বেশি জামাতের সেবা করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বরিশালের পক্ষ থেকে

নাসের আহমদ

তারিখ	মার্চ ২০১১ MTA এর বাংলা অনুষ্ঠানসূচী (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টা)

www.mta.tv

atabshir@hotmail.com